خاک و باد و آب و آتش زنده اند
با من و تو مرده با حق زنده اند

মোটকথা, সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও কাফিরদের পক্ষে নবুয়ত অস্বীকার করা যেমন আশ্চর্যের বিষয়, তার চাইতেও অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কিয়ামতে পুনর্জীবন ও হাশরের দিন অস্বীকার করা।

এরপর অবিশ্বাসীদের শাস্তি উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এরা শুধু আপনাকেই অস্বীকার করে না ; বরং প্রকৃতপক্ষে পালনকর্তাকে অস্বীকার করে। তাদের শাস্তি এই যে, তাদের গর্দানে লৌহশৃঙ্খল পরানো হবে এবং তারা চিরকাল দোযখে বাস করবে।

কাফিরদের দ্বিতীয় সন্দেহ ছিল এই ঃ যদি বাস্তবিকই আপনি আল্লাহ্‌র রসূল হয়ে থাকেন, তবে রসূলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আপনি যেসব শাস্তির কথা শুনান, সেগুলো আসে না কেন? দ্বিতীয় আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে ঃ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ -

অর্থাৎ তারা বিপদমুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে আপনার কাছে বিপদ নাযিল হওয়ার তাগাদা করে (যে আপনি নবী হয়ে থাকলে তাৎক্ষণিক আযাব এনে দিন। এতে বোঝা যায় যে, তারা আযাব আসাকে খুবই অবান্তর অথবা অসম্ভব মনে করে)। অথচ তাদের পূর্বে অন্য কাফিরদের উপর অনেক আযাব এসেছে। সকলেই তা প্রত্যক্ষ করেছে। এমতাবস্থায় ওদের উপর আযাব আসা অবান্তর হল কিরূপে? এখানে مَثُلَاتٌ শব্দটি مَثُلَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ অপমানকর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।

এরপর বলা হয়েছে ঃ নিশ্চিতই আপনার পালনকর্তা মানুষের গোনাহ্ ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। যারা এ ক্ষমা ও দয়া দ্বারা উপকৃত হয় না এবং অবাধ্যতায় ডুবে থাকে, তাদের জন্য তিনি কঠোর শাস্তিদাতাও। কাজেই কোনরূপ ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত থাকা উচিত নয় যে, আল্লাহ্ যখন ক্ষমাশীল, দয়ালু তখন আমাদের উপর কোন আযাব আসতেই পারে না।

কাফিরদের তৃতীয় সন্দেহ ছিল এই ঃ আমরা রসূল (সা)-এর অনেক মু'জিযা দেখেছি কিন্তু বিশেষ ধরনের যেসব মু'জিযা আমরা দেখতে চাই, সেগুলো তিনি প্রকাশ করেন না কেন? এর উত্তর তৃতীয় আয়াতে দেওয়া হয়েছে ঃ

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ط إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ -

অর্থাৎ কাফিররা আপনার নবুয়তের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বলে যে, আমরা যে বিশেষ মু'জিযা দেখতে চাই; তা তাঁর উপর নাযিল করা হল না কেন? এর উত্তর এই যে, মু'জিযা জাহির করা পয়গম্বরের ইচ্ছাধীন নয়; বরং এটা সরাসরি আল্লাহ্‌র কাজ। তিনি যখন যে ধরনের মু'জিযা প্রকাশ করতে চান, করেন। তিনি কারও দাবী ও খায়েশ পূরণ করতে বাধ্য নন। এ জন্যেই বলা হয়েছে ঃ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ অর্থাৎ আপনার কাজ শুধু কাফিরদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা--মু'জিযা জাহির করা নয়।

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ---অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শক ছিল। আপনি একক নবী নন। জাতিকে পথপ্রদর্শন করা সব পয়গম্বরেরই দায়িত্ব ছিল। মু'জিযা প্রকাশ করার ক্ষমতা কাউকে দেওয়া হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা যখন যে ধরনের মু'জিযা প্রকাশ করতে চান, করেন।

প্রত্যেক সম্প্রদায় ও দেশে পয়গম্বর আসা কি জরুরী ? ঃ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন সম্প্রদায় ও ভূখণ্ড পথপ্রদর্শক থেকে খালি থাকতে পারে না; যে কোন পয়গম্বর হোক কিংবা পয়গম্বরের প্রতিনিধিরূপে তাঁর দাওয়াতের প্রচারক হোক। উদাহরণত সূরা ইয়াসীনে পয়গম্বরের পক্ষ থেকে প্রথমে দু'ব্যক্তিকে কোন সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণের কথা উল্লিখিত রয়েছে। তাঁরা স্বয়ং নবী ছিলেন না। এরপর তাদের সাহায্য ও সমর্থনের জন্য তৃতীয় ব্যক্তিকে পাঠানোর কথা বর্ণিত হয়েছে।

তাই এ আয়াত থেকে এটা জরুরী হয় না যে, হিন্দুস্তানে কোন নবী ও রসূল জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে রসূলের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য এ দেশে প্রচুর সংখ্যক আলিমের আগমন প্রমাণিত রয়েছে। এ ছাড়া এ জাতীয় অসংখ্য পথপ্রদর্শক যে এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাও সবার জানা।

এ পর্যন্ত তিন আয়াতে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের সন্দেহের জওয়াব বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ আয়াতে আবার তওহীদের আসল বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। সূরার শুরু থেকেই এ সম্পর্কে আলোচনা হয়ে এসেছে। বলা হয়েছে ঃ

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ○

অর্থাৎ প্রত্যেক নারী যে গর্ভধারণ করে, তা ছেলে না মেয়ে, সুশ্রী না কুশ্রী, সৎ না অসৎ---তা সবই আল্লাহ্ জানেন এবং নারীদের গর্ভাশয়ে যে হ্রাসবৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ কোন সময় এক সন্তান জন্মগ্রহণ করে, কোন সময় দ্রুত কোন সময় দেরীতে---তাও আল্লাহ্ জানেন।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি 'আলিমুল-গায়িব'। সৃষ্টজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু ও সে সবের পরিবর্তনশীল অবস্থা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল। এর সাথেই মানব সৃষ্টির প্রতিটি স্তর প্রতিটি পরিবর্তন ও প্রতিটি চিহ্ন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গর্ভস্থ সন্তান ছেলে না মেয়ে না উভয়ই; না কিছুই না--শুধু পানি অথবা বায়ু রয়েছে--- এসব বিষয়ের নিশ্চিত ও নির্ভুল জ্ঞান একমাত্র তিনিই রাখেন। লক্ষণাদিদৃষ্টে কোন হাকীম অথবা ডাক্তার এ ব্যাপারে যে মত ব্যক্ত করে, তার মর্যাদা, ধারণা ও অনুমানের চাইতে বেশি নয়। অনেক সময় বাস্তব ঘটনা এর বিপরীত প্রকাশ পায়। আধুনিক এক্সরে মেশিনও এ সত্য উদঘাটন করতে অক্ষম। এর সত্যিকার ও নিশ্চিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই রাখেন। এ বিষয়টিই অন্য এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ---অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন যাকিছু গর্ভাশয়ে রয়েছে।

আরবী ভাষায় تَغِيْض শব্দটি হ্রাস পাওয়া শুষ্ক হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতে এর বিপরীতে تَزْدَاد শব্দ এসে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যে, এখানে অর্থ হ্রাস পাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, জননীর গর্ভাশয়ে যা কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, তার বিশুদ্ধ জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলাই রাখেন। এ হ্রাস-বৃদ্ধির অর্থ গর্ভজাত সন্তানের সংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে, অর্থাৎ গর্ভে এক সন্তান আছে কিংবা বেশি এবং জন্মের সময়ও হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে, অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তান কত মাস, কত দিন ও কত ঘন্টায় জন্মগ্রহণ করে একজন বাহ্যিক মানুষের অস্তিত্ব লাভ করবে, তার নিশ্চিত জ্ঞানও আল্লাহ্ ছাড়া কেউ রাখতে পারে না।

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ গর্ভাবস্থায় নারীদের যে রক্তপাত হয়, তা গর্ভস্থ সন্তানের দৈহিক আয়তন ও স্বাস্থ্য হ্রাসের কারণে হয়। تَغِيْضُ الْأَرْحَامِ বলে এই হ্রাস বোঝানো হয়েছে। বাস্তব সত্য এই যে, হ্রাসের যত প্রকার রয়েছে, আয়াতের ভাষা সব-গুলোতেই পরিব্যাপ্ত। কাজেই কোন বিরোধ নেই।

كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ---অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রত্যেক বস্তুর একটি বিশেষ অনুমান ও মাপ নির্দিষ্ট রয়েছে। এর কমও হতে পারে না এবং বেশিও হতে পারে না। সন্তানের সব অবস্থাও এর অন্তর্ভুক্ত। তার প্রত্যেকটি বিষয় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নির্ধারিত আছে। কতদিন গর্ভে থাকবে, কতকাল দুনিয়াতে জীবিত থাকবে এবং

কি পরিমাণ রিযিক পাবে---এসব বিষয়ে আল্লাহ্‌র অনুপম জ্ঞান তাঁর তওহীদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ۝٩ سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ
اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۢ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ
بِالنَّهَارِ ۝١٠ لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ
مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا
بِاَنْفُسِهِمْ ۭ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْۗءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ
مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ۝١١ هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ
السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝١٢ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰۗىِٕكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ
ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَاۗءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ
فِي اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ۝١٣ لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۭ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَاۗءِ
لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ۭ وَمَا دُعَاۗءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝١٤
وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ
بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۝١٥

(৯) তিনি সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় অবগত, মহোত্তম, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (১০) তোমাদের মধ্যে কেউ গোপনে কথা বলুক বা তা সশব্দে প্রকাশ করুক, রাতের অন্ধকারে সে আত্মগোপন করুক বা প্রকাশ্য দিবালোকে বিচরণ করুক; সবাই তাঁর নিকট সমান। (১১) তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে তাদের অগ্রে এবং পশ্চাতে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে তারা ওদের হিফাযত করে। আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে। আল্লাহ্ যখন

কোন জাতির উপর বিপদ চান, তখন তা রদ হওয়ার নয় এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (১২) তিনিই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দেখান ভয়ের জন্য এবং আশার জন্য এবং উত্থিত করেন ঘন মেঘমালা। (১৩) তাঁর প্রশংসা পাঠ করে বজ্র নির্ঘোষ এবং সব ফেরেশতা, সভয়ে। তিনি বজ্রপাত করেন, অতঃপর যাকে ইচ্ছা, তাকে তা দ্বারা আঘাত করেন; তথাপি তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতণ্ডা করে, অথচ তিনি মহাশক্তিশালী। (১৪) সত্যের আহবান একমাত্র তাঁরই এবং তাঁকে ছাড়া যাদেরকে ডাকে, তারা তাদের কোন কাজে আসে না; ওদের দৃষ্টান্ত সেরূপ, যেমন কেউ দু'হাত পানির দিকে প্রসারিত করে যাতে পানি তার মুখে পৌঁছে যায়; অথচ পানি কোন সময় পৌঁছবে না। কাফিরদের যত আহবান তার সবই পথভ্রষ্টতা। (১৫) আল্লাহ্কে সিজদা করে যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের প্রতিচ্ছায়াও সকাল-সন্ধ্যায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তিনি সব গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞানী, সবার বড় (এবং) সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি চুপি চুপি কথা বলে এবং যে উচ্চৈঃস্বরে বলে এবং যে রাত্রে কোথাও আত্মগোপন করে এবং সে দিবালোকে চলাফেরা করে, তারা সব (আল্লাহ্র জ্ঞান) সমান। (অর্থাৎ তিনি সবাইকে সমভাবে জানেন। তিনি যেমন তোমাদের প্রত্যেককে জানেন, তেমনিভাবে প্রত্যেকের হিফাযতও করেন। সেমতে তোমাদের মধ্যে থেকে) প্রত্যেকের (হিফাযতের) জন্য কিছু ফেরেশতা (নির্ধারিত) রয়েছে, যারা অদল-বদল হতে থাকে। কিছু তার সামনে এবং কিছু তার পশ্চাতে। তারা আল্লাহ্র নির্দেশে (অনেক বিপদাপদ থেকে) তার হিফাযত করে। (এতে কেউ যেন মনে না করে যে, যখন ফেরেশতা আমাদের হিফাযত করে, তখন যা ইচ্ছা, কর; তা কুফুরীই হোক না কেন। আযাব নাযিলই হবে না। এরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা (প্রাথমিক পর্যায়ে তো কাউকে আযাব দেন না। তাঁর চিরাচরিত রীতি এই যে, তিনি) কোন জাতির (ভাল) অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত তারা নিজেদের যোগ্যতাবলে স্বীয় অবস্থা পরিবর্তন না করে। (কিন্তু এর সাথে এটাও আছে যে, যখন তারা নিজেদের প্রতিভায় ত্রুটি করতে থাকে, তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের প্রতি বিপদ ও শাস্তি নেমে আসে)। এবং যখন আল্লাহ্ কোন জাতিকে বিপদে পতিত করতে চান, তখন তা রদ করার কোন উপায়ই নেই। (তা পতিত হয়ে যায়)। এবং (এমন মুহূর্তে) আল্লাহ্ ব্যতীত (যাদের হিফাযতের ধারণা তারা পোষণ করে) তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (এমন কি, ফেরেশতাও তাদের হিফাযত করে না--- করলেও সে হিফাযত তাদের কাজে আসবে না।) তিনি এমন (মহীয়ান) যে, তোমাদেরকে (বৃষ্টিপাতের সময়) বিদ্যুৎ (চমকানো অবস্থায়) দেখান, যদ্দরুন (তা পতিত হওয়ার) ভয়ও হয় এবং (তা থেকে বৃষ্টির) আশাও হয় এবং তিনি পানিভর্তি মেঘমালাকে (ও) উত্তোলন করেন এবং রা'দ (ফেরেশতা) তাঁর প্রশংসা কীর্তন করে এবং অন্যান্য ফেরেশতাও তাঁর ভয়ে প্রশংসা ও গুণ কীর্তন করে)। এবং তিনি (পৃথিবীর দিকে) বজ্র প্রেরণ

করেন অতঃপর যার উপর ইচ্ছা ফেলে দেন এবং তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে (অর্থাৎ তাঁর তওহীদ সম্পর্কে, তাঁর এমন মহীয়ান হওয়া সত্ত্বেও) তর্ক-বিতর্ক করে; অথচ তিনি প্রবল পরাক্রমশালী। (ভয় করার যোগ্য; কিন্তু তারা ভয় করে না এবং তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করে। তিনি এমন দোয়া কবুলকারী যে,) সত্য দোয়া বিশেষভাবে তাঁরই (কেননা, তা কবুল করার শক্তি তাঁর আছে।) আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে তারা (প্রয়োজনে ও বিপদে) ডাকে, তারা (শক্তিহীন হওয়ার কারণে) তাদের আবেদন এতটুকুই মঞ্জুর করতে পারে, যতটুকু পানি ঐ ব্যক্তির দরখাস্ত মঞ্জুর করে যে উভয় হাত পানির দিকে প্রসারিত করে (এবং ইঙ্গিতে নিজের দিকে ডাকে), যাতে তা (অর্থাৎ পানি) তার মুখ পর্যন্ত (উড়ে) এসে যায়, অথচ তা) (নিজে নিজে) তার মুখ পর্যন্ত (কিছুতেই) আসবে না। (সুতরাং পানি যেমন তাদের আবেদন মঞ্জুর করতে অক্ষম তেমনিভাবে তাদের উপাস্যরাও অপারক। তাই তাদের কাছে) কাফিরদের আবেদন নিষ্ফল বৈ নয়। আল্লাহ্ তা'আলারই সামনে (অর্থাৎ তিনি এমন সর্বশক্তিমান যে, তাঁরই সামনে) সবাই মাথা নত করে---যারা আছে নভোমণ্ডলে এবং যারা আছে ভূমণ্ডলে; (কেউ) খুশীতে এবং (কেউ) বাধ্যবাধকতায়। (খুশীতে মাথা নত করার মানে স্বেচ্ছায় তাঁর ইবাদত করা এবং বাধ্যবাধকতার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে সৃষ্টজীবের মধ্যে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চান, সে তার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না)। এবং তাদের (অর্থাৎ পৃথিবীবাসীদের) প্রতিচ্ছায়াও (মাথা নত করে) সকালে ও বিকালে। অর্থাৎ ছায়াকে যতটুকু ইচ্ছা বাড়ান এবং যতটুকু ইচ্ছা সঙ্কুচিত করেন। যেহেতু এই হ্রাস-বৃদ্ধি, সকাল-বিকালে বেশী প্রকাশ পায়, তাই বিশেষভাবে সকাল-বিকাল উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা ছায়াও সর্বাবস্থায় অনুগত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছিল। সেগুলো ছিল প্রকৃতপক্ষে তওহীদের প্রমাণ। এ আয়াতে বলা হয়েছেঃ

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ এখানে غيب শব্দ দ্বারা ঐ বস্তু বুঝান হয়েছে যা মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাছে অনুপস্থিত; অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না, নাকে ঘ্রাণ নেওয়া যায় না, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ বোঝা যায় না এবং হাতে স্পর্শ করা যায় না।

এর বিপরীত شهادة হচ্ছে ঐ সব বস্তু, যেগুলো উল্লিখিত পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়। আয়াতের অর্থ এই যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণ যে তিনি প্রত্যেক অনুপস্থিতকে এমনিভাবে জানেন, যেমন উপস্থিত ও বিদ্যমানকে জেনে থাকেন।

الكبير শব্দের অর্থ বড় এবং متعال -এর অর্থ উচ্চ। উভয় শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তিনি সৃষ্ট বস্তুসমূহের গুণাবলীর ঊর্ধ্বে এবং সবার চেয়ে বড়। কাফির ও মুশরিকরা সংক্ষেপে আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব ও উচ্চমর্যাদা স্বীকার করত, কিন্তু উপলব্ধি

দোষে তারা আল্লাহ্‌কে সাধারণ মানুষের সমতুল্য জ্ঞান করে তাঁর জন্য এমন গুণাবলী সাব্যস্ত করত, যেগুলো তাঁর মর্যাদার পক্ষে খুবই অসম্ভব। উদাহরণত ইহুদী ও খৃস্টানরা আল্লাহ্‌র জন্য পুত্র সাব্যস্ত করেছে। কেউ কেউ তাঁর জন্য মানুষের ন্যায় দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করেছে এবং কেউ কেউ বিশেষ দিক নির্ধারণ করেছে। অথচ তিনি এসব অবস্থা ও গুণ থেকে উচ্চে, উর্ধ্বে ও পবিত্র। কোরআন পাক তাদের বর্ণিত গুণাবলী থেকে পবিত্রতা প্রকাশের জন্য বার বার বলেছে ঃ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ঐসব গুণ থেকে পবিত্র, যেগুলো তারা বর্ণনা করে।

প্রথম ঃ اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى -এর তৎপূর্ববর্তী عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ-এর বাক্যে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছিল। দ্বিতীয় اَلْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ বাক্যে শক্তি ও মাহাত্ম্যের পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর শক্তির ও সামর্থ্য মানুষের কল্পনার উর্ধ্বে। এর পরবর্তী আয়াতেও এ জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠা একটি বিশেষ আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ

اَسَرَّ শব্দটি اسرار থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আস্তে কথা বলা এবং جهر শব্দের অর্থ, জোরে কথা বলা। অপরকে শোনানোর জন্য যে কথা বলা হয়, তাকে جهر বলে এবং যে কথা স্বয়ং নিজেকে শোনানোর জন্য বলা হয়, তাকে سر বলে مستخف শব্দের অর্থ যে গা ঢাকা দেয় এবং سارب-এর অর্থ যে স্বাধীন নিশ্চিন্তভাবে পথ চলে।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান সর্বব্যাপী। কাজেই যে ব্যক্তি আস্তে কথা বলে এবং যে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে, তারা উভয়ই আল্লাহ্‌র কাছে সমান। তিনি উভয়ের কথা সমভাবে শোনেন এবং জানেন। এমনিভাবে যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দেয় এবং যে ব্যক্তি দিবালোকে প্রকাশ্য রাস্তায় চলে, তারা উভয়ই আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তির দিক দিয়ে সমান। উভয়ের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা তিনি সমভাবে জানেন এবং উভয়ের উপর তাঁর শক্তি সমভাবে পরিব্যাপ্ত। কেউ তাঁর ক্ষমতার আওতা-বহির্ভূত নয়। এ বিষয়টিই পরবর্তী আয়াতে আরও ব্যক্ত করে বলা হয়েছে ঃ

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ

مُعَقِّبٰتٌ শব্দটি مُعَقِّبَةٌ--এর বহুবচন। যে দল অপর দলের পেছনে কাছাকাছি হয়ে আসে, তাকে مُعَقِّبَةٌ অথবা مُتَعَقِّبَةٌ বলা হয়। مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ-এর শাব্দিক অর্থ উভয় হাতের মাঝ খানে। উদ্দেশ্য মানুষের সম্মুখ দিক। مِنْ خَلْفِهٖ-এর অর্থ পশ্চাদ্দিক مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ এখানে مِنْ কারণবোধক অর্থ দেয়; অর্থাৎ بِاَمْرِ اللّٰهِ কোন কোন কিরাআতে এ শব্দটি بِاَمْرِ اللّٰهِ বর্ণিতও আছে। (রূহুল-মা'আনী)

আয়াতের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কথা গোপন করতে কিংবা প্রকাশ করতে চায় এবং যে ব্যক্তি চলাফেরাকে রাতের অন্ধকারে ডেকে রাখতে চায় অথবা প্রকাশ্য সড়কে ঘোরাফেরা করে---এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের দল নিযুক্ত রয়েছে। তার সম্মুখ ও পশ্চাদ্দিক থেকে তাকে ঘিরে রাখে। তাদের কাজ ও দায়িত্ব পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তারা একের পর এক আগমন করে। আল্লাহ্‌র নির্দেশে মানুষের হিফাযত করা তাদের দায়িত্ব।

সহীহ্ বুখারীর হাদীসে বলা হয়েছেঃ ফেরেশতাদের দুটি দল হিফাযতের জন্য নিযুক্ত রয়েছেন। একদল রাত্রির জন্য এবং একদল দিনের জন্য। উভয় দল ফজরের ও আসরের নামাযের সময় একত্রিত হন। ফজরের নামাযের পর রাতের পাহারাদার দল বিদায় যান এবং দিনের পাহারাদাররা কাজ বুঝে নেন। আসরের নামাযের পর তাঁরা বিদায় হয়ে যান এবং রাতের ফেরেশতা দায়িত্ব নিয়ে চলে আসেন।

আবূ দাউদের এক হাদীসে হযরত আলী মুর্তজা (রা)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মানুষের সাথে কিছু সংখ্যক হিফাযতকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। তার উপর যাতে কোন প্রাচীর ধ্বসে না পড়ে কিংবা সে কোন গর্তে পতিত না হয় কিংবা কোন জন্তু অথবা মানুষ তাকে কষ্ট না দেয় ইত্যাদি বিষয়ে ফেরেশতাগণ তার হিফাযত করেন। তবে কোন মানুষকে বিপদাপদে জড়িত করার জন্য যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ জারি হয়ে যায়, তখন হিফাযতকারী ফেরেশতারা সেখান থেকে সরে যায়।--(রূহুল-মা'আনী)

হযরত উসমান গণী (রা)-এর রেওয়ায়েতে ইবনে-জরীরের এক হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, হিফাযতকারী ফেরেশতাদের কাজ শুধু পার্থিব বিপদাপদ ও দুঃখকষ্ট থেকে

হিফাযত করাই নয়; বরং তারা মানুষকে পাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখারও চেষ্টা করেন। মানুষের মনে সাধুতা ও আল্লাহ্‌ভীতির প্রেরণা জাগ্রত করেন যাতে সে গুনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকে। এরপরও যদি সে ফেরেশতাদের প্রেরণার প্রতি উদাসীন হয়ে পাপে লিপ্ত হয়ে যায় তবে তারা দোয়া ও চেষ্টা করে যাতে সে শীঘ্র তওবা করে পাক হয়ে যায়। অগত্যা যদি সে কোনরূপেই হুঁশিয়ার না হয়, তখন তারা তার আমলনামায় গোনাহ্‌ লিখে দেয়।

মোটকথা এই যে, হিফাযতকারী ফেরেশতা দীন ও দুনিয়া উভয়ের বিপদাপদ থেকে মানুষের নিদ্রায় ও জাগরণে হিফাযত করে। হযরত কা'ব আহবার বলেন ঃ মানুষের উপর থেকে আল্লাহ্‌র হিফাযতের এই পাহারা সরিয়ে দিলে জিনদের অত্যাচারে মানবজীবন অতিষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এসব রক্ষামূলক পাহারা ততক্ষণ পর্যন্তই কার্যকর থাকে, যতক্ষণ তকদীরে-ইলাহী মানুষের হিফাযতের অনুমতি দেয়। যদি আল্লাহ্‌ তা'আলাই কোন বান্দাকে বিপদে জড়িত করতে চান, তবে এসব রক্ষামূলক পাহারা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়টিই বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ -

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ স্বয়ং তারাই নিজেদের অবস্থা ও কাজকর্ম মন্দ ও অশান্তিতে পরিবর্তিত করে না নেয়। (তারা যখন নিজেদের অবস্থা অবাধ্যতা ও নাফরমানীতে পরিবর্তিত করে নেয়, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলাও স্বীয় কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন। বলা বাহুল্য) যখন আল্লাহ্‌ তা'আলাই কাউকে আযাব দিতে চান, তখন কেউ তা রদ করতে পারে না এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিপরীতে তার সাহায্যার্থে কেউ এগিয়ে আসতে পারে না।

সারকথা এই যে, মানুষের হিফাযতের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের পাহারা নিয়োজিত থাকে; কিন্তু সম্প্রদায় যখন আল্লাহ্‌র নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করে কুকর্ম, কুচরিত্র ও অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলাও স্বীয় রক্ষামূলক পাহারা উঠিয়ে নেন। এরপর আল্লাহ্‌র গযব ও আযাব তাদের উপর নেমে আসে। এ আযাব থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকে না।

এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, আলোচ্য আয়াতের অবস্থা পরিবর্তন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যখন কোন সম্প্রদায় আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার পথ ত্যাগ করে স্বীয় অবস্থায় মন্দ পরিবর্তন সূচিত করে, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলাও স্বীয় অনুকম্পা ও হিফাযতের কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন।

এ আয়াতের অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা করা হয় যে, কোন জাতির জীবনে কল্যাণকর বিপ্লব ততক্ষণ পর্যন্ত আসে না, যতক্ষণ তারা এ কল্যাণকর বিপ্লবের জন্য

নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নিজেদেরকে তার যোগ্য করে না নেয়। এ অর্থেই নিম্নোক্ত কবিতাটি সুবিদিত ঃ

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সে পর্যন্ত কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন নি যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করার খেয়াল করেছে।

এ বিষয়বস্তুটি যদিও কিছুটা নির্ভুল; কিন্তু আলোচ্য আয়াতের অর্থ এরূপ নয়। কবিতার বিষয়বস্তুটি একটি সাধারণ আইন হিসেবে নির্ভুল। অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বয়ং নিজের অবস্থা সংশোধন করার ইচ্ছা করে না, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেও তাকে সাহায্য করার ওয়াদা নেই। সাহায্য করার ওয়াদা তখনই কার্যকর হয় যখন কেউ স্বয়ং সংশোধনের চেষ্টা করে; যেমন এক আয়াত اَلَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকেও হিদায়তের পথ তখনই উন্মুক্ত হয়, যখন কারও মধ্যে হিদায়তের অন্বেষণ থাকে। কিন্তু আল্লাহ্র নিয়ামত দান এ আইনের অধীন নয়। অনেক সময় অন্বেষণ ছাড়াই নিয়ামত দান করা হয়।

داد حق را قابلیت شرط نیست
بلکہ شرط قابلیت داد اوست

অর্থাৎ আল্লাহ্র দানের জন্য যোগ্যতা শর্ত নয়, যোগ্যতা ব্যতীতও তাঁর দান এসে পতিত হয়।

স্বয়ং আমাদের অস্তিত্ব ও তন্মধ্যস্থিত অসংখ্য নিয়ামত আমাদের চেষ্টার ফলশ্রুতি নয়। আমরা কোন সময় এরূপ দোয়াও করিনি যে, আমাদেরকে এমন সত্তা দান করা হোক যার চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ ও যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিখুঁত হয়। এসব নিয়ামত চাওয়া ছাড়াই পাওয়া গেছে।

ما نبودیم و تقاضا ما نبود
لطف تو ناگفتہ ما می شنود

অর্থাৎ আমি ছিলাম না এবং আমার তরফ থেকে কোন প্রার্থনাও ছিলনা, তোমার অনুগ্রহই আমার না বলা প্রার্থনা শ্রবণ করেছে।

তবে নিয়ামত দানের যোগ্যতা ও ওয়াদা স্বকীয় চেষ্টা ব্যতীত অর্জিত হয় না এবং কোন জাতির পক্ষে চেষ্টা ও কর্ম ব্যতীত নিয়ামতদানের অপেক্ষায় থাকা আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছু নয়।

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন। এটা মানুষের জন্য ভয়েরও কারণ হতে পারে। কারণ, এটা যে জায়গায় পতিত হয় সবকিছু জ্বালিয়ে ছাইভস্ম করে দেয়। আবার এটা আশাও সঞ্চার করে যে, বিদ্যুৎ চমকানোর পর বৃষ্টি হবে, যা মানুষ ও জীবজন্তুর জীবনের অবলম্বন। এবং আল্লাহ্ তা'আলাই বড় বড় ভারী মেঘমালাকে মৌসুমী বায়ুতে রূপান্তরিত করে উত্থিত করেন এবং জলপূর্ণ মেঘমালাকে শূন্যে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যান। এরপর স্বীয় ফয়সালা ও তকদীর অনুযায়ী যথা ইচ্ছা, তা বর্ষণ করেন।

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ---অর্থাৎ রা'দ আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার তসবীহ্ পাঠ করে এবং ফেরেশতারাও তাঁর ভয়ে তসবীহ্ পাঠ করে। সাধারণের পরিভাষায় রা'দ বলা হয় মেঘের গর্জনকে, যা মেঘমালার পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হয়। এর তসবীহ্ পাঠ করার অর্থ ঐ তসবীহ্, যে সম্পর্কে কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে উল্লিখিত রয়েছে যে, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে এমন কোন বস্তু নেই, যে আল্লাহ্র তসবীহ্ পাঠ করে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই তসবীহ্ শুনতে সক্ষম হয় না।

কোন কোন হাদীসে আছে যে, বৃষ্টি বর্ষণের কাজে নিযুক্ত ও আদিষ্ট ফেরেশতার নাম রা'দ। এই অর্থে তসবীহ্ পাঠ করার মানে সুস্পষ্ট।

وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ---এখানে صواعق শব্দটি صاعقة এর বহুবচন। এর অর্থ বজ্র, যা মাটিতে পতিত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই এসব বিদ্যুৎ মর্ত্যে প্রেরণ করেন, যেগুলো দ্বারা যাকে ইচ্ছা জ্বালিয়ে দেন।

وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ---এখানে محال শব্দটি মীমের যেরযোগে কৌশল, শাস্তি, শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হয়, আয়াতের অর্থ এই যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার তওহীদের ব্যাপারে পারস্পরিক কলহ-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত রয়েছে; অথচ আল্লাহ্ তা'আলা শক্তিশালী কৌশলকারী। তাঁর সামনে সবার চাতুরী অচল।

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي

الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ أَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ
شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۭ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ
كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ
أَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۭ وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ
عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ۭ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ
اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۭ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ
النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۭ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾

(১৬) জিজ্ঞেস করুনঃ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা কে? বলে দিনঃ আল্লাহ্। বলুনঃ তবে কিঃ তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত এমন অভিভাবক স্থির করেছ, যারা নিজেদের ভাল-মন্দেরও মালিক নয়? বলুনঃ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হয়? অথবা কোথাও কি অন্ধকার ও আলো সমান হয়? তবে কি তারা আল্লাহ্র জন্য এমন অংশীদার স্থির করেছে যে, তারা কিছু সৃষ্টি করেছে, যেমন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্? অতঃপর তাদের সৃষ্টি এরূপ বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে? বলুনঃ আল্লাহ্ই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি একক, পরাক্রমশালী। (১৭) তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর স্রোতধারা প্রবাহিত হতে থাকে নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী। অতঃপর স্রোতধারা স্ফীত ফেনারাশি উপরে নিয়ে আসে। এবং অলংকার অথবা তৈজসপত্রের জন্য যে বস্তুকে আগুনে উত্তপ্ত করে, তাতেও তেমনি ফেনারাশি থাকে। এমনিভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন। অতএব, ফেনা তো শুকিয়ে খতম হয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিতে অবশিষ্ট থাকে। আল্লাহ্ এভনিভাবে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (তাদেরকে এইভাবে) বলুনঃ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা (উদ্ভাবক ও স্থায়িত্বদাতা, অর্থাৎ, স্রষ্টা ও সংরক্ষক) কে? (যেহেতু এ প্রশ্নের জবাব নির্দিষ্ট, তাই জওয়াবও) আপনি (-ই) বলে দিনঃ আল্লাহ্। (অতঃপর আপনি) বলুন তবুও কি (তওহীদের এসব প্রমাণ শুনে) তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সাহায্যকারী (অর্থাৎ উপাস্য) স্থির করে রেখেছ, যারা (চরম অক্ষমতাবশত) স্বয়ং নিজেদের লাভ-লোকসানেরও ক্ষমতা রাখে না? (অতঃপর শিরক খণ্ডন ও তওহীদ সপ্রমাণ করার পর তওহীদপন্থী ও শিরক-পন্থী এবং

স্বয়ং তওহীদ ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য ফুটিয়ে তোলার জন্য) আপনি (আরও) বলুন ঃ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? (এ হচ্ছে শিরক ও তওহীদের দৃষ্টান্ত)। অথবা তারা আল্লাহ্‌র এমন অংশীদার সাব্যস্ত করেছে যে, ওরাও। (কোন বস্তু) সৃষ্টি করেছে, যেমন আল্লাহ্ (তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ীও) সৃষ্টি করেন? অতঃপর (এ কারণে) তাদের কাছে (উভয়ের) সৃষ্টিকর্ম একরূপ মনে হয়েছে? (এবং এ থেকে তারা প্রমাণ করেছে যে, উভয়েই যখন একরূপ স্রষ্টা তখন উভয়েই একরূপ উপাস্যও হবে। এ সম্পর্কেও) আপনি (-ই) বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তা'আলাই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনিই (সত্তা ও পূর্ণতার গুণাবলীতে) একক (এবং সব সৃষ্টবস্তুর উপর) প্রবল। আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর (পানি দ্বারা) নালা (ভর্তি হয়ে) প্রবাহিত হতে লাগল নিজ পরিমাণ অনুযায়ী (অর্থাৎ ছোট নালায় অল্প পানি এবং বড় নালায় বেশী পানি)। অতঃপর জলস্রোত (পানির) উপরে ভাসমান আবর্জনা বইয়ে আনল। (এক আবর্জনা হল এই)। এবং যে বস্তুকে অগ্নির মধ্যে (রেখে) অলঙ্কার অথবা অন্য তৈজসপত্র (পাত্র ইত্যাদি) তৈরীর উদ্দেশ্যে উত্তপ্ত করা হয়, তাতেও এমনি আবর্জনা (উপরে ভাসমান) রয়েছে। (অতএব এ দৃষ্টান্তদ্বয়ের মধ্যে দু'বস্তু আছে। একটি উপকারী বস্তু অর্থাৎ আসল পানি ও আসল মাল এবং অপরটি অকেজো বস্তু অর্থাৎ আবর্জনা ও ময়লা। মোট কথা) আল্লাহ্ তা'আলা সত্য (অর্থাৎ তওহীদ, ঈমান ইত্যাদি) ও মিথ্যার (অর্থাৎ কুফর, শিরক ইত্যাদির) এমনি ধরনের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেনে (যা পরবর্তী বিষয়বস্তু দ্বারা পূর্ণতা লাভ করবে)। **অতএব (উল্লিখিত দৃষ্টান্তদ্বয়ের মধ্যে) যা আবর্জনা, তা তো ফেলে দেওয়া হয় এবং যা মানুষের** উপকার করে, তা পৃথিবীতে (হিতকর অবস্থায়) অবশিষ্ট থাকে। (এবং সত্য ও মিথ্যার যেমন উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে) আল্লাহ্ তা'আলা এমনিভাবে (প্রত্যেক জরুরী বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে) উদাহরণসমূহ বর্ণনা করেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উভয় দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, এসব দৃষ্টান্তে ময়লা ও আবর্জনা যেমন কিছু-ক্ষণের জন্য আসল বস্তুর উপরে দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু পরিণামে তা আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয় এবং আসল বস্তু অবশিষ্ট থাকে, তেমনি মিথ্যাকে যদিও কিছুদিন সত্যের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করতে দেখা যায়; কিন্তু অবশেষে মিথ্যা বিলুপ্ত ও পর্যুদস্ত হয় এবং সত্য অবশিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত থাকে।---(জালালাইন)

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ۭ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ
لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ۭ اُولٰۗىِٕكَ
لَهُمْ سُوْۗءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝ اَفَمَنْ

يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا
يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا
يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ صَبَرُوا
ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾
جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَ
ذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾

(১৮) যারা পালনকর্তার আদেশ পালন করে, তাদের জন্যে উত্তম প্রতিদান রয়েছে এবং যারা আদেশ পালন করে না, যদি তাদের কাছে জগতের সব কিছু থাকে এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে সবই নিজেদের মুক্তিপণস্বরূপ দিয়ে দিবে। তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর হিসাব। তাদের আবাস হবে জাহান্নাম। সেটা কতই না নিকৃষ্ট অবস্থান! (১৯) যে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, যে অন্ধ? তারাই বোঝে, যারা বোধশক্তিসম্পন্ন। (২০) ইহারা এমন লোক, যারা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। (২১) এবং যারা বজায় রাখে ঐ সম্পর্ক, যা বজায় রাখতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন এবং স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় করে এবং কঠোর হিসাবের আশংকা রাখে। (২২) এবং যারা স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টির জন্যে সবর করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা মন্দের বিপরীতে ভাল করে, তাদের জন্যে রয়েছে পরকালের গৃহ। (২৩) তা হচ্ছে বসবাসের বাগান। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী স্ত্রী ও সন্তানেরা। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। (২৪) বলবে ঃ তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণাম-গৃহ কতই না চমৎকার!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা স্বীয় পালনকর্তার আদেশ পালন করে (এবং তওহীদ ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করে,) তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান (অর্থাৎ জান্নাত নির্ধারিত) আছে এবং যারা তাঁর আদেশ পালন করে না (এবং কুফর ও গোনাহে কায়েম থাকে) তাদের কাছে (কিয়ামতের দিন) যদি সারা জগতের বিষয়-সম্পদ (বিদ্যমান) থাকে, (বরঞ্চ) তার সাথে সে সবের সমপরিমাণ আরও (অর্থসম্পদ) থাকে, তবে সবই মুক্তির জন্য দিয়ে ফেলবে। তাদের কঠোর শাস্তি হবে। (অন্য এক আয়াতে سُوْءُ الْحِسَابِ 'মুশকিল হিসাব' বলা হয়েছে)। তাদের ঠিকানা (সদাসর্বদার জন্য) দোযখ। এটা নিকৃষ্ট অবস্থানস্থল। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, যা কিছু আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা সবই সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির মত হতে পারে, যে (এ জ্ঞান থেকে নিরেট) অন্ধ? (অর্থাৎ কাফির ও মু'মিন সমান নয়)। অতএব, বুদ্ধিমানরাই উপদেশ গ্রহণ করে (এবং) তারা (বুদ্ধিমানরা) এমন যে, আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং (এ) অঙ্গীকার ভঙ্গ ক.র না এবং তারা এমন যে, আল্লাহ্ যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ দিয়েছেন, সেগুলো বজায় রাখে, স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় করে এবং কঠোর শাস্তির আশংকা করে (যা বিশেষভাবে কাফিরদের জন্যই। তাই কুফর থেকে বেঁচে থাকে)। এবং তারা এমন যে, স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টির কামনায় (সত্য ধর্মে) অটল থাকে, নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, তা থেকে গোপনেও এবং প্রকাশ্যভাবেও (যখন যেরূপ করা সমীচীন হয়) ব্যয় করে এবং (অপরে) দুর্ব্যবহারকে (যা তাদের সাথে করা হয়) সদ্ব্যবহার দ্বারা এড়িয়ে যায়। (অর্থাৎ কেউ তাদের সাথে অসদ্ব্যবহার করলে তারা কিছু মনে করে না; বরং তার সাথে সদ্ব্যবহার করে)। তাদের জন্য সে জগতে (অর্থাৎ পরকালে) উত্তম পরিণাম রয়েছে, (অর্থাৎ সদাসর্বদা বসবাসের উদ্যান,) যাতে তারাও প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতামাতা স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা (জান্নাতের) যোগ্য (অর্থাৎ মু'মিন) হবে, (যদিও পূর্বোক্তদের সমপর্যায়ভুক্ত না হয়) তারাও (জান্নাতে তাদের কল্যাণে তাদেরই শ্রেণীতে) প্রবেশ করবে এবং ফেরেশতারা তাদের কাছে প্রত্যেক (দিকের) দরজা দিয়ে আগমন করবে। (তারা বলবে ঃ) তোমরা (প্রত্যেক বিপদ আশংকা থেকে) শান্তিতে থাকবে এ কারণে যে, (তোমরা সত্যধর্মে) অটল ছিলে। অতএব এ জগতে তোমাদের পরিণাম খুবই ভাল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উদাহরণের মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে সত্যপন্থী ও মিথ্যাপন্থীদের লক্ষণাদি, গুণাবলী, ভাল ও মন্দ কাজকর্ম এবং প্রতিদান ও শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার বিধানাবলী পালন ও আনুগত্যকারীদের জন্য উত্তম প্রতিদান এবং অবাধ্যতাকারীদের জন্য কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে উভয় প্রকার লোকদের উদাহরণ 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান' দ্বারা দেওয়া হয়েছে এবং পরিশেষে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ---অর্থাৎ বিষয়টি যদিও সুস্পষ্ট ; কিন্তু এটি তারাই বুঝতে পারে, যারা বুদ্ধিমান। পক্ষান্তরে অমনোযোগিতা ও গোনাহ্ যাদের বিবেককে অকর্মণ্য করে রেখেছে, তারা এতবড় তফাৎটুকুও বোঝে না।

তৃতীয় আয়াতে উভয় দলের বিশেষ কাজকর্ম ও লক্ষণের বর্ণনা শুরু হয়েছে। প্রথমে আল্লাহ্র বিধানাবলী পালনকারীদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ---অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে। সৃষ্টির সূচনায় আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে যেসব ওয়াদা অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, এখানে সেগুলোই বুঝান হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ছিল পালনকর্তা সম্পর্কিত অঙ্গীকার। এটি সৃষ্টির সূচনাকালে সকল আত্মাকে সমবেত করে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল ঃ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ---অর্থাৎ আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই ?

উত্তরে সবাই সমস্বরে বলেছিল ঃ بَلَى অর্থাৎ হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই আমাদের পালনকর্তা।

এমনিভাবে যাবতীয় বিধি-বিধানের আনুগত্য, সমস্ত ফরয কর্ম পালন এবং অবৈধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে উপদেশ এবং বান্দার পক্ষ থেকে স্বীকারোক্তি কোরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ ---অর্থাৎ তারা কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। ঐ অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ্ তা'আলা ও বান্দার মধ্যে রয়েছে এবং এইমাত্র يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ঐসব অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো উম্মতের লোকেরা আপন পয়গম্বরের সাথে সম্পাদন করে এবং ঐসব অঙ্গীকারও বোঝান হয়েছে, যেগুলো মানবজাতি একে অপরের সাথে করে।

আবূ দাউদ আওফ ইবনে মালেকের রিওয়ায়েতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে-কিরামের কাছ থেকে এ বিষয়ে অঙ্গীকার ও বায়'আত নিয়েছেন যে, তাঁরা আল্লাহ্র সাথে কাউকে অংশীদার করবেন না, পাঞ্জেগানা নামায পাবন্দি সহকারে আদায় করবেন, নিজেদের মধ্যকার শাসক শ্রেণীর আনুগত্য করবেন এবং কোন মানুষের কাছে কোন কিছু যাচ্ঞা করবেন না।

যারা এ বায়'আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, অঙ্গীকার পালনের ব্যাপারে তাঁদের নিষ্ঠার তুলনা ছিল না। অশ্বারোহণের সময় তাঁদের হাত থেকে চাবুক পড়ে গেলেও তাঁরা কোন মানুষকে চাবুকটি উঠিয়ে দিতে বলতেন না; বরং স্বয়ং নিচে নেমে তা উঠিয়ে নিতেন।

এটা ছিল সাহাবায়ে-কিরামের মনে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ভালবাসা, মাহাত্ম্য ও আনুগত্য প্রসূত প্রেরণার প্রভাব। নতুবা বলাই বাহুল্য যে, এ ধরনের যাচ্ঞা নিষিদ্ধ করা উদ্দেশ্য ছিল না। উদাহরণত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) একবার মসজিদে প্রবেশ করছিলেন। এমতাবস্থায় দেখলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ভাষণ দিচ্ছেন। ঘটনাক্রমে তাঁর মসজিদে প্রবেশ করার সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুখ থেকে 'বসে যাও' কথাটি বের হয়ে গেল। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ জানতেন যে, এর অর্থ এটা নয় যে, কেউ সড়কে অথবা সভাস্থলের বাইরে থাকলেও সেখানেই বসে যাবে। কিন্তু আনুগত্যের প্রেরণা তাঁকে সামনে পা বাড়াতে দিল না। দরজার বাইরেই যেখানে এ বাক্যটি কানে এসেছিল, তিনি সেখানেই বসে গেলেন।

আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যশীল বান্দাদের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ---অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তারা সেগুলো বজায় রাখে। এ বাক্যটির প্রচলিত তফসীর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আত্মীয়তার যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং তদনুযায়ী কাজ করতে আদেশ করেছেন, তারা সেসব সম্পর্ক বজায় রাখে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এর অর্থ এই যে, তারা ঈমানের সাথে সৎকর্মকে অথবা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাসের সাথে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের প্রতি এবং তাঁদের গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাসকে যুক্ত করে।

চতুর্থ গুণ এই ঃ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ---অর্থাৎ তারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে। এখানে خوف শব্দের পরিবর্তে خشية শব্দ ব্যবহার করায় এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তাদের ভয় হিংস্র জন্তু অথবা ইতর মানুষের প্রতি স্বাভাবিক ভয়ের মত নয়। বরং তা পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের এবং উস্তাদের প্রতি শিষ্যের অভ্যাসগত ভয়ের মত। কষ্টদানের আশংকা এ ভয়ের কারণ নয়; বরং মাহাত্ম্য ও ভালবাসার কারণে বান্দা এরূপ আশংকা করে যে, আমাদের কোন কর্ম অথবা কথা যেন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অপছন্দনীয় না হয়ে যায়। এ কারণেই যেখানে প্রশংসা স্থলে আল্লাহ্র ভয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই خشية শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ, মাহাত্ম্য ও ভালবাসার কারণ থেকে উদ্ভূত ভয়কে خشية বলা হয়। এ কারণেই পরবর্তী বাক্যে হিসাব কিতাবের কঠোরতার ভয় বর্ণনা প্রসঙ্গে خشية এর পরিবর্তে خوف শব্দটি ব্যবহার করে বলা হয়েছে ঃ

وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ---অর্থাৎ তারা মন্দ হিসাবকে ভয় করে। 'মন্দ হিসাব' বলে কঠোর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব বোঝান হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা যদি কৃপাবশত সংক্ষেপে ও মার্জনা সহকারে হিসাব গ্রহণ করেন, তবেই মানুষ মুক্তি পেতে পারে। নতুবা যার কাছ থেকেই পুরোপুরি ও কড়ায় গণ্ডায় হিসাব নেওয়া হবে, তার পক্ষে আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভবপর হবে না। কেননা, এমন ব্যক্তি কে আছে, যে জীবনে কখনো কোন গোনাহ্ বা ত্রুটি করেন নি? এ হচ্ছে সৎ ও আনুগত্যশীল বান্দাদের পঞ্চম গুণ।

ষষ্ঠ গুণ এইঃ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ---অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করার আশায় অকৃত্রিমভাবে ধৈর্যধারণ করে।

প্রচলিত কথায় কোন বিপদ ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করাকেই সবরের অর্থ মনে করা হয় কিন্তু আরবী ভাষায় এর অর্থ আরও অনেক ব্যাপক। কারণ, আসল অর্থ হচ্ছে স্বভাব-বিরুদ্ধ বিষয়াদির কারণে অস্থির না হওয়া; বরং দৃঢ়তা সহকারে নিজের কাজে ব্যাপৃত থাকা। এ কারণেই এর দুটি প্রকার বর্ণনা করা হয়। এক. صبر على الطاعة অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান পালনে দৃঢ় থাকা এবং দুই. صبر عن المعصية অর্থাৎ গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় থাকা।

সবরের সাথে ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ কথাটি যুক্ত হয়ে ব্যক্ত করেছে যে, সবর সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় নয়। কেননা, কোন না কোন সময় বেসবর ব্যক্তিরও দীর্ঘ দিন পরে হলেও সবর এসেই যায়। কাজেই যে সবর ইচ্ছাধীন নয়, তার বিশেষ কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এরূপ অনিচ্ছাধীন কাজের আদেশ আল্লাহ্ তা'আলা দেন না। এ জন্যই রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ الصبر عند الصدمة الاولى অর্থাৎ আসল ও ধর্তব্য সবর তাই যা বিপদের প্রাথমিক পর্যায়ে অবলম্বন করা হয় নতুবা পরবর্তীকালে তো কোন কোন সময় বাধ্যতামূলকভাবে মানুষের মধ্যে সবর এসেই যায়। সুতরাং স্বেচ্ছায় স্বভাব-বিরুদ্ধ বিষয়কে সহ্য করাই প্রশংসনীয় সবর; তা হোক কোন ফরয ও ওয়াজিব পালন করা কিংবা হারাম ও মকরূহ বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করা।

এ কারণেই যদি কোন ব্যক্তি চুরির নিয়তে কোন গৃহে প্রবেশ করে, অতঃপর সুযোগ না পেয়ে সবর করে ফিরে আসে, তবে এ অনিচ্ছাধীন সবর কোন প্রশংসনীয় ও সওয়াবের কাজ নয়। সওয়াব তখনই হবে, যখন গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা আল্লাহ্র ভয়ে ও তাঁর সন্তুষ্টির কারণে হয়।

সপ্তম গুণ হচ্ছে ঃ أَقَامُوا الصَّلٰوةَ---'নামায কায়েম করার' অর্থ পূর্ণ আদব ও শর্ত এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে নামায আদায় করা---শুধু নামায পড়া নয়। এ জন্যই কোরআনে নামাযের নির্দেশ সাধারণত اِقَامَةُ صَلٰوةٍ শব্দ সহযোগে দেওয়া হয়েছে।

অষ্টম গুণ হচ্ছে ঃ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক থেকে কিছু আল্লাহ্র নামেও ব্যয় করে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছে চান না ; বরং নিজেরই দেওয়া রিযিকের কিছু অংশ তাও মাত্র শতকরা আড়াই ভাগের মত সামান্যতম পরিমাণ তোমাদের কাছে চান। এটা দেওয়ার ব্যাপারে স্বভাবত তোমাদের ইতস্তত করা উচিত নয়।

অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার সাথে سِرًّا وَّعَلَانِيَةً শব্দ দু'টি যুক্ত হওয়ায় বুঝা যায় যে, সদকা-খয়রাত সর্বত্র গোপনে করাই সুন্নত নয়; বরং মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে করাও দুরস্ত ও শুদ্ধ। এ জন্যেই আলিমগণ বলেন যে, যাকাত ও ওয়াজিব সদকা প্রকাশ্যে দেওয়াই উত্তম এবং গোপনে দেওয়া সমীচীন নয়---যাতে অন্যরাও শিক্ষা ও উৎসাহ পায়। তবে নফল সদকা-খয়রাত গোপনে দেওয়াই উত্তম। যেসব হাদীসে গোপনে দেওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে নফল সদকা সম্পর্কেই বলা হয়েছে।

নবম গুণ হচ্ছে ঃ يَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ অর্থাৎ তারা মন্দকে ভাল দ্বারা, শত্রুতাকে বন্ধুত্ব দ্বারা এবং অন্যায় ও জুলুমকে ক্ষমা ও মার্জনা দ্বারা প্রতিহত করে। মন্দের জওয়াবে মন্দ ব্যবহার করে না। কেউ কেউ এ বাক্যটির এরূপ অর্থ বর্ণনা করেন যে, পাপকে পুণ্য দ্বারা ব্যবহৃত করে। অর্থাৎ কোন সময় কোন গোনাহ্ হয়ে গেলে তারা অধিকতর যত্ন সহকারে অধিক পরিমাণে ইবাদত করে। ফলে গোনাহ্ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (স.) হযরত মু'আয (রা)-কে বলেন ঃ পাপের পর পুণ্য করে নাও, তাহলে তা পাপকে মিটিয়ে দিবে। অর্থ এই যে, যখন পাপের পর অনুতপ্ত হয়ে তওবা করবে এবং এর পশ্চাতে পুণ্য কাজ করবে, তখন এ পুণ্য কাজ বিগত গোনাহ্কে মিটিয়ে দিবে। অনুতাপ ও তওবা ব্যতীত পাপের পর কোন পুণ্য কাজ করে নেওয়া পাপমুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়।

আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যশীলদের নয়টি গুণ বর্ণনা করার পর তাদের প্রতিদান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ دَار শব্দের অর্থ এখানে

دار اخرت অর্থাৎ পরকাল। আয়াতের অর্থ হচ্ছে তাদের জন্যই রয়েছে পরকালের সাফল্য। কেউ কেউ বলেন ঃ এখানে دار دنيا বলে دار অর্থাৎ ইহকাল বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই, সৎ লোকেরা যদি দুনিয়াতে কষ্টেরও সম্মুখীন হয়; কিন্তু পরিণামে দুনিয়াতেও সাফল্য তাদেরই প্রাপ্য অংশ হয়ে থাকে।

অতঃপর عقبى الدار অর্থাৎ পরকালের সাফল্য বর্ণিত হয়েছে যে, তা হচ্ছে جنّٰتُ عَدْنٍ তারা এগুলোতে প্রবেশ করবে। عدن শব্দের অর্থ হচ্ছে অবস্থান ও স্থায়িত্ব। উদ্দেশ্য এই যে, এসব জান্নাত থেকে কখনও তাদেরকে বহিষ্কার করা হবে না; বরং এগুলোতে তাদের অবস্থান চিরস্থায়ী হবে। কেউ কেউ বলেন ঃ জান্নাতের মধ্যস্থলের নাম আদন। জান্নাতের স্থানসমূহের মধ্যে এটা উচ্চস্তরের।

এরপর তাদের জন্য আরও একটি পুরস্কার উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার এ নিয়ামত শুধু তাদের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং তাদের বাপদাদা, স্ত্রী ও সন্তানরাও এর অংশ পাবে। শর্ত এই যে, তাদের উপযুক্ত হতে হবে। এর ন্যূনতম স্তর হচ্ছে মুসলমান হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের বাপদাদা ও স্ত্রীদের নিজস্ব আমল যদিও এ স্তরে পৌঁছার যোগ্য নয়; কিন্তু আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের খাতিরে ও বরকতে তাদেরকেও এ উচ্চস্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে।

এরপর তাদের আরও একটি পরকালীন সাফল্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম করতে করতে প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবে ঃ সবরের কারণে তোমরা যাবতীয় দুখ-কষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছ। এটা পরকালের কতই না উত্তম পরিণাম !

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ
اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ
وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ۝٢٥ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۭ
وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۭ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ۝٢٦
وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۭ قُلْ اِنَّ
اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ۝٢٧ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَتَطْمَىِٕنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۭ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَىِٕنُّ الْقُلُوْبُ ۝٢٨

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ﴿٢٩﴾ كَذَٰلِكَ
أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ
الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ
إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾

(২৫) এবং যারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে দৃঢ় ও পাকাপোক্ত করার পর তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, ওরা ঐ সমস্ত লোক যাদের জন্য রয়েছে অভিসম্পাত এবং ওদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। (২৬) আল্লাহ্ যার জন্যে ইচ্ছা রুযী প্রশস্ত করেন এবং সংকুচিত করেন। তারা পার্থিব জীবনের প্রতি মুগ্ধ। পার্থিব জীবন পরকালের সামনে অতি সামান্য সম্পদ বৈ নয়। (২৭) কাফিররা বলে ঃ তাঁর প্রতি তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হল না? বলে দিন, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যে মনোনিবেশ করে, তাকে নিজের দিকে পথপ্রদর্শন করেন। (২৮) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে ; জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়। (২৯) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ এবং মনোরম প্রত্যাবর্তনস্থল! (৩০) এমনিভাবে আমি আপনাকে একটি উম্মতের মধ্যে প্রেরণ করেছি। তাদের পূর্বে অনেক উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে। যাতে আপনি তাদেরকে ঐ নির্দেশ শুনিয়ে দেন, যা আমি আপনার কাছে প্রেরণ করেছি। তথাপি তারা দয়াময়কে অস্বীকার করে। বলুন ঃ তিনিই আমার পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কারও উপাসনা নাই। আমি তাঁর উপরই ভরসা করেছি এবং তাঁর দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে পাকাপোক্ত করার পর ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ যেসব সম্পর্ক বজায় রাখার আদেশ দিয়েছেন, সেগুলো ছিন্ন করে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে, এরূপ লোকদের প্রতি অভিসম্পাত হবে এবং তাদের জন্য সেই জগতে মন্দ অবস্থা হবে। (অর্থাৎ বাহ্যিক ধনৈশ্বর্য দেখে এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, তারা আল্লাহ্‌র রহমত পাচ্ছে। কেননা, ধনৈশ্বর্য তথা রিযিকের অবস্থা এই যে) আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অধিক রিযিক দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা রিযিক) সংকীর্ণ করে দেন। (রহমত ও গযবের মাপকাঠি এরূপ নয়।) এবং তারা (কাফিররা) পার্থিব জীবন নিয়ে (এবং এর বিলাস-ব্যসন নিয়ে) হর্ষোৎফুল্ল হয়। (তাদের এরূপ হর্ষোৎফুল্ল হওয়া সম্পূর্ণ নিরর্থক ও ভুল। কেননা) পার্থিব জীবন (ও এর

বিলাস-ব্যসন) পরকালের মোকাবিলায় একটি সামান্য সম্পদ বৈ কিছু নয়। কাফিররা (আপনার নবুয়তে দোষারোপ ও আপত্তি করার উদ্দেশ্যে) বলেঃ তাঁর (পয়গম্বরের) প্রতি কোন মু'জিযা (আমরা যা চাই সেরূপ মু'জিযাসমূহের মধ্য থেকে) তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কেন অবতীর্ণ করা হল না? আপনি বলে দিনঃ বাস্তবিকই (তোমাদের এসব বাজে ফরমায়েশ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে) আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, পথভ্রষ্ট করে দেন। (বোঝা যাওয়ার কারণ এই যে, কোরআনের মত সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযাসহ যথেষ্ট মু'জিযা সত্ত্বেও ওরা অনর্থক বায়না ধরে। এতে বোঝা যায় যে, তাদের ভাগ্যেই পথভ্রষ্টতা লিখিত রয়েছে।) এবং (হঠকারীদের হিদায়তের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা কোরআন যথেষ্ট হয়নি এবং তাদের ভাগ্যে পথভ্রষ্টতা জুটেছে, তেমনি) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করে (এবং সত্য পথ অন্বেষণ করে, পরবর্তী اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ الخ আয়াতে যার বাস্তবরূপ ব্যক্ত হয়েছে। তাকে নিজের দিকে পৌঁছার পথ প্রদর্শন করার জন্য) হিদায়ত করে দেন (এবং পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন)। তারা ঐ সব লোক, যা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহ্র যিকির দ্বারা (যার বড় অংশ হচ্ছে কোরআন) তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে (যার বড় অংশ হচ্ছে ঈমান। অর্থাৎ তারা কোরআনের অলৌকিকতাকে নবুয়ত প্রমাণের জন্য যথেষ্ট মনে করে এবং আবোল-তাবোল ফরমায়েশ করে না। এরপর আল্লাহ্র যিকির ও ইবাদতে এত আনন্দ যে, কাফিরদের মত পার্থিব জীবনে তত আনন্দ হয় না। এবং) ভালভাবে জেনে নাও যে, আল্লাহ্র যিকির (-এর এমনি বৈশিষ্ট্য যে, তা) দ্বারা অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায়। (অর্থাৎ যে পর্যায়ের যিকির সেই পর্যায়ের প্রশান্তি লাভ হয়। সেমতে কোরআন দ্বারা ঈমান এবং সৎকর্ম দ্বারা ইবাদতের সাথে নিবিড় সম্পর্ক ও আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ অর্জিত হয়। মোটকথা,) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, (যাদের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে,) তাদের জন্য (দুনিয়াতে) সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং (পরকালে) উত্তম পরিণতি রয়েছে। এ বিষয়টি অন্য আয়াতে فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ الخ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।) এমনিভাবে আমি আপনাকে এমন এক উম্মতের মধ্যে রসূলরূপে প্রেরণ করেছি যে, এর (অর্থাৎ এ উম্মতের) পূর্বে আরও অনেক উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে (এবং আপনাকে এদের প্রতি রসূলরূপে প্রেরণ করার কারণ হলো) যাতে আপনি তাদেরকে ঐ গ্রন্থ পাঠ করে শোনান, যা আমি আপনার কাছে ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছি এবং (এই বিরাট নিয়ামতের কদর করা এবং মু'জিযা-রূপী এ গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তাদের উচিত ছিল ; কিন্তু) তারা পরম দয়াশীলের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে (এবং কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না।) আপনি বলে দিনঃ (তোমাদের বিশ্বাস স্থাপন না করাতে আমার কোন ক্ষতি নেই। কেননা তোমরা অধিকতরভাবে আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে। এ জন্য আমি ভীত নই। কারণ) তিনিই আমার পালনকর্তা (ও রক্ষক।) তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। (অতএব

নিশ্চয়ই তিনি পূর্ণ গুণসম্পন্ন হবেন এবং হিফাযতের জন্যে যথেষ্ট হবেন। তাই) আমি তাঁর উপরই ভরসা করেছি এবং তাঁর কাছেই আমাকে যেতে হবে। (মোট কথা এই যে, আমার হিফাযতের জন্য তো আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট। তোমরা আমার বিরুদ্ধাচরণ করে কিছুই করতে পারবে না। তবে এতে তোমাদেরই ক্ষতি হবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

রুকূর শুরুতে সমগ্র মানবজাতিকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করে বলা হয়েছিল যে, তাদের একদল আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত ও একদল অবাধ্য। অতঃপর অনুগত বান্দাদের কতিপয় গুণ ও আলামত বর্ণিত হয়েছে এবং পরকালে তাদের জন্যে সর্বোত্তম প্রতিদানের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে দ্বিতীয় প্রকার লোকদের আলামত ও গুণাবলী এবং তাদের শাস্তির কথা বর্ণিত হচ্ছে। এতে অবাধ্য বান্দাদের একটি স্বভাব বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ — অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ তা'আলার অঙ্গীকারকে পাকাপোক্ত করার পর ভঙ্গ করে। আল্লাহ্ তা'আলার অঙ্গীকারের মধ্যে সেই অঙ্গীকারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা সৃষ্টির সূচনাকালে আল্লাহ্র পালনকর্তৃত্ব ও একত্ব সম্পর্কে সব আত্মার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। কাফির ও মুশরিকরা দুনিয়াতে এসে সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং আল্লাহ্র মোকাবিলায় শত শত পালনকর্তা ও উপাস্য তৈরী করেছে।

এছাড়া ঐসব অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেগুলো পালন করা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' চুক্তির অধীনে মানুষের জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়। কারণ, কালিমায়ে তাইয়্যেবা, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' প্রকৃতপক্ষে একটি মহান চুক্তির শিরোনাম। এর অধীনে আল্লাহ্ ও রসূলের বর্ণিত বিধি-বিধান পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকারও এসে যায়। তাই কোন মানুষ যখন আল্লাহ্ অথবা রসূলের কোন আদেশ অমান্য করে, তখন সে ঈমানের চুক্তিই লঙ্ঘন করে।

অবাধ্য বান্দাদের দ্বিতীয় স্বভাব এরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ — অর্থাৎ তারা ঐসব সম্পর্ক ছিন্ন করে, যেগুলো বজায় রাখতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে মানুষের যে সম্পর্ক, এখানে সেই সম্পর্কও বুঝানো হয়েছে। তাঁদের প্রদত্ত বিধি-বিধান অমান্য করাই হচ্ছে এ সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ। এছাড়া আত্মীয়তার সম্পর্কও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। কোরআন পাকের স্থানে স্থানে এসব সম্পর্ক বজায় রাখা ও এগুলোর হক আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমান বান্দারা এসব হক ও সম্পর্কও ছিন্ন করে। উদাহরণত

পিতামাতা, ভাই-বোন, প্রতিবেশী ও অন্যান্য আত্মীয়ের যেসব অধিকার আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রসূল মানুষের উপর আরোপ করেছেন, তারা এগুলো আদায় করে না।

তৃতীয় স্বভাব এই ঃ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ—অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে। এ তৃতীয় স্বভাবটি প্রকৃতপক্ষে প্রথমোক্ত দু'স্বভাবেরই ফলশ্রুতি। যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও মানুষের অঙ্গীকারের পরওয়া করে না এবং কারও অধিকার ও সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য করে না, তাদের কর্মকাণ্ড যে অপরাপর লোকদের ক্ষতি ও কষ্টের কারণ হবে, তা বলাই বাহুল্য। ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারি কাটাকাটির বাজার গরম হবে। এটাই পৃথিবীর সর্বৃহৎ ফাসাদ।

অবাধ্য বান্দাদের এই তিনটি স্বভাব বর্ণনা করার পর তাদের শাস্তি উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ—অর্থাৎ তাদের জন্য লা'নত ও মন্দ আবাস রয়েছে। লা'নতের অর্থ আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে থাকা এবং বঞ্চিত হওয়া। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে থাকাই সর্বাপেক্ষা বড় আযাব এবং সব বিপদের বড় বিপদ।

বিধান ও নির্দেশ ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহের মধ্যে মানবজীবনের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কিত বিশেষ বিশেষ বিধান ও নির্দেশ পাওয়া যায় ---কিছু স্পষ্টত এবং কিছু ইঙ্গিতে। উদাহরণত উল্লেখ্য ঃ

(১) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ ----থেকে প্রমাণিত হয় যে, কারও সাথে কোন চুক্তি করা হলে তা পালন করা ফরয এবং লঙ্ঘন করা হারাম; চুক্তিটি আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে হোক, যেমন ঈমানের চুক্তি; কিংবা সৃষ্টজগতের মধ্যে কোন মুসলমান অথবা কাফিরের সাথে হোক----চুক্তি লঙ্ঘন করা সর্বাবস্থায় হারাম।

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ---থেকে জানা যায় যে, ইসলাম বৈরাগ্য গ্রহণ করত জাগতিক চাহিদা ও বিষয়াদি ত্যাগ করা শিক্ষা দেয় না; বরং সম্পর্কিতদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করাকে ইসলামে অপরিহার্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। পিতামাতার অধিকার, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ও ভাই-বোনদের অধিকার এবং অন্যান্য আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের অধিকার পূরণ করা আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের জন্য অপরিহার্য করেছেন। এগুলোর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে নফল ইবাদত অথবা কোন ধর্মীয় কাজে আত্মনিয়োগ করাও জায়েয নয়। এমতাবস্থায় অন্য কাজে গেলে এগুলো ভুলে যাওয়া কিরূপে জায়েয হবে?

কোরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, আত্মীয়দেরকে দেখা-শোনা করা এবং তাদের অধিকার প্রদান করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে রিযিকের প্রশস্ততা ও কাজে-কর্মে বরকত কামনা করে, তার উচিত আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার অর্থ আত্মীয়দের দেখা-শোনা করা এবং সাধ্যানুযায়ী তাদের সাহায্য-সহায়তা করা।

হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা) বলেনঃ জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গৃহে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলঃ আমাকে বলুন, ঐ আমল কোন্‌টি যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে ঠেলে দিবে? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত কর; তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করো না, নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ।---(বগভী)

সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, আত্মীয়-স্বজনের অনুগ্রহের বিনিময়ে অনুগ্রহ করাকেই আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা বলে না; বরং কোন আত্মীয় যদি তোমার অধিকার প্রদানে ত্রুটি করে, তোমার সাথে সম্পর্ক না রাখে; এরপরও শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তার সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করাই হচ্ছে প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।

আত্মীয়দের অধিকার প্রদান করা এবং তাদের সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ নিজেদের বংশ-তালিকা সংরক্ষিত রাখ। এর মাধ্যমেই আত্মীয়তা সংরক্ষিত থাকতে পারবে এবং তোমরা তাদের অধিকার প্রদান করতে পারবে। তিনি আরও বলেছেনঃ সম্পর্ক বজায় রাখার উপকারিতা এই যে, এতে পারস্পরিক ভালবাসা সৃষ্টি হয়, ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং আয়ুতে বরকত হয়। ---(তিরমিযী)

সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে এটা প্রধান যে, পিতার মৃত্যুর পর পিতার বন্ধুদের সাথে তেমনি সম্পর্ক বজায় রাখবে, যেমন তাঁর জীবদ্দশায় রাখা হত।

(৩) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ---কোরআন ও হাদীসে সবরের অনেক ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণত সবরকারী আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গ ও সাহায্য লাভ করে এবং অগণন সওয়াব ও পুরস্কার পায়। উপরোক্ত আয়াত থেকে জানা যায় যে, এসব ফযিলত তখনই লাভ হয় যখন আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে সবর এখতিয়ার করা হয়।

সবরের আসল অর্থ মনকে বশে রাখা এবং দৃঢ় থাকা। এর আবার শ্রেণীভেদ আছে। এক. কষ্ট ও বিপদে সবর অর্থাৎ অস্থির ও নিরাশ না হওয়া এবং আল্লাহ্র দিকে দৃষ্টি রেখে আশাবাদী হওয়া। দুই. ইবাদতে সবর অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধানাবলী পালন করা

কঠিন মনে হলেও তাতে অটল থাকা। তিন. গোনাহ্ ও মন্দ কাজ থেকে সবর অর্থাৎ মন মন্দ কাজের দিকে ধাবিত হতে চাইলেও আল্লাহ্র ভয়ে সেদিকে ধাবিত না হওয়া।

(৪) وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ---থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্র পথে গোপন ও প্রকাশ্যে উভয় প্রকারে ব্যয় করা দুরস্ত। তবে ওয়াজিব সদকা যেমন যাকাত, ফিতরা ইত্যাদি প্রকাশ্যে দেওয়া উত্তম---যাতে অন্য মুসলমানগণ তা দিতে উৎসাহিত হয়। পক্ষান্তরে নফল দান-খয়রাত গোপনে প্রদান করা উচিত, যাতে রিয়া ও নামযশের সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

(৫) يَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ — প্রত্যেক মন্দকে প্রতিহত করা একটি যুক্তিগত ও স্বভাবগত দাবী। এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, মন্দ দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করা ইসলামের নীতি নয়। বরং ইসলামের শিক্ষা এই যে, মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত কর। কেউ তোমার উপর জুলুম করলে তুমি তার সাথে ন্যায়ানুগ আচরণ কর। যে তোমার সম্পর্কের হক প্রদান করেনি, তুমি তার হক প্রদান কর। কেউ রাগ করলে তুমি তার জওয়াব সহনশীলতার মাধ্যমে দাও। এর অনিবার্য পরিণতি হবে এই যে, শত্রু ও মিত্রে পরিণত হবে এবং দুষ্টও তোমার সামনে শিষ্ট হয়ে যাবে।

এ বাক্যের আরও একটি অর্থ এই যে, ইবাদত দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। যদি কোন সময় কোন গোনাহ্ হয়ে যায়, তবে অনতিবিলম্বে তওবা কর এবং এরপর আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে মনোনিবেশ কর। এতে তোমার বিগত গোনাহ্ও মাফ হয়ে যাবে।

হযরত আবূযর গিফারীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, তোমার দ্বারা যখন কোন মন্দ কাজ অথবা গোনাহ্ হয়ে যায়, তখন সাথে সাথে কোন সৎকাজ করে নাও। এতে গোনাহ্ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।---(আহমদ, মাযহারী) শর্ত এই যে, বিগত গোনাহ্ থেকে তওবা করে সৎকাজ করতে হবে।

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ

---এর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ নিজেরা তো জান্নাতে স্থান পাবেই, তাদের খাতিরে তাদের পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানরাও স্থান পাবে। শর্ত এই যে, তাদেরকে যোগ্য অর্থাৎ মু'মিন-মুসলমান হতে হবে---কাফির হলে চলবে না। তাদের সৎকর্ম আল্লাহ্র প্রিয় বান্দার সমান না হলেও আল্লাহ্ তা'আলা তার বরকতে তাদেরকেও জান্নাতে তার স্থানে পৌঁছিয়ে দেবেন। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ — অর্থাৎ আমি সৎ বান্দাদের বংশধর ও সন্তান-সন্ততিকেও তাদের সাথে মিলিত করে দেব।

এতে জানা যায় যে, বুযুর্গদের সাথে বংশ আত্মীয়তা অথবা বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকা পরকালে ঈমানের শর্তসহ উপকারী হবে।

(৬) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ---থেকে জানা যায়

যে, পরকালীন মুক্তি, উচ্চ মর্তবা ইত্যাদি সব দুনিয়াতে সবর করার ফলশ্রুতি। অর্থাৎ দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর বান্দাদের হক আদায় করতে হবে এবং আল্লাহ্র অবাধ্য থেকে বেঁচে থাকার জন্য মনকে বাধ্য করতে হবে।

أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ---পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে

যেমন অনুগত বান্দাদের প্রতিদান উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, তাদের স্থান হবে জান্নাতে, ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম করে বলবে যে, এসব নিয়ামত তোমাদের সবর ও আনুগত্যের ফলশ্রুতি; তেমনিভাবে এ আয়াতে অবাধ্যদের অশুভ পরিণতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তাদের উপর আল্লাহ্র লা'নত অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের আবাস অবধারিত। এতে বোঝা যায় যে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অভিসম্পাত ও জাহান্নামের কারণ। نعوذ بالله منه

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ
كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ ۗ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَايْئَسِ الَّذِينَ آمَنُوا
أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ
كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ
حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ
بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ
عِقَابِ ﴿٣٢﴾ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۚ وَجَعَلُوا لِلَّهِ
شُرَكَاءَ ۗ قُلْ سَمُّوهُمْ ۗ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ
أَم بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا
عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

(৩১) যদি কোন কোরআন এমন হত, যার সাহায্যে পাহাড় চলমান হয় অথবা যমীন খণ্ডিত হয় অথবা মৃতরা কথা বলে, তবে কি হত? বরং সব কাজ তো আল্লাহ্‌র হাতে। ঈমানদাররা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয় যে, যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে সব মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করতেন? কাফিররা তাদের কৃতকর্মের কারণে সবসময় আঘাত পেতে থাকবে অথবা তাদের গৃহের নিকটবর্তী স্থানে আঘাত নেমে আসবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ওয়াদা না আসে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ওয়াদা খেলাপ করেন না। (৩২) আপনার পূর্বে কত রসূলের সাথে ঠাট্টা করা হয়েছে। অতঃপর আমি কাফিরদেরকে কিছু অবকাশ দিয়েছি, এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি। অতএব কেমন ছিল আমার শাস্তি! (৩৩) ওরা প্রত্যেকেই কি মাথার উপর স্ব স্ব কৃতকর্ম নিয়ে দণ্ডায়মান নয়? এবং তারা আল্লাহ্‌র জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করে! বলুন; নাম বল অথবা খবর দাও পৃথিবীর এমন কিছু জিনিস সম্পর্কে যা তিনি জানেন না? অথবা অসার কথাবার্তা বলছ? বরং সুশোভিত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য তাদের প্রতারণাকে এবং তাদেরকে সৎপথে থেকে বাধা দান করা হয়েছে। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (হে পয়গম্বর এবং হে মুসলমানগণ, কাফিরদের একগুঁয়েমির অবস্থা এই যে, কোরআন যে মু'জিযা তা চিন্তা-ভাবনার উপর নির্ভরশীল। বর্তমান এই অবস্থায় কোরআনের পরিবর্তে) যদি কোন কোরআন এমন হত, যার সাহায্যে পাহাড় (স্ব স্থান থেকে) হটিয়ে দেওয়া হত অথবা তার সাহায্যে ভূপৃষ্ঠে দ্রুত অতিক্রম করা যেত অথবা তার সাহায্যে মৃতদের সাথে কাউকে আলাপ করিয়ে দেয়া যেত (অর্থাৎ মৃত জীবিত হয়ে যেত এবং কেউ তার সাথে আলাপ করে নিত। কাফিররা প্রায়ই এসব মু'জিযার ফরমায়েশ করত; কেউ সাধারণভাবেই এবং কেউ এভাবে যে, কোরআনকে বর্তমান অবস্থায় আমরা মু'জিযা বলে স্বীকার করি না। তবে যদি কোরআন দ্বারা এসব অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায়, তবেই আমরা একে মু'জিযা বলে মেনে নেব। উদ্দেশ্য এই যে, কোরআন দ্বারা এমন সব মু'জিযাও প্রকাশ পেত, যাতে উভয় প্রকার লোকদের ফরমায়েশ পূর্ণ হয়ে যেত অর্থাৎ যারা শুধু উল্লিখিত অলৌকিক ঘটনাবলী দাবী করত এবং যারা কোরআনের সাহায্যে এগুলোর প্রকাশ চাইত)। তবুও তারা বিশ্বাস স্থাপন করত না। (কেননা, এসব কারণ সত্যিকার ক্রিয়াশীল নয়) এবং সমগ্র ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'আলারই। (তিনি যাকে তওফীক দেন, সে-ই ঈমান আনয়ন করে। তাঁর রীতি এই যে, তিনি তলবকারীকে তওফীক দেন এবং একগুঁয়েকে বঞ্চিত রাখেন। কোন কোন মুসলমান মনে মনে কামনা করত যে, এসব মু'জিযা প্রকাশিত হয়ে গেলে সম্ভবত তারা ঈমান আনয়ন করবে। অতঃপর এই প্রেক্ষিতে তাদেরকে জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে) বিশ্বাসীদের কি (এ কথা শুনে যে, এরা একগুঁয়ে, সুতরাং বিশ্বাস স্থাপন করবে না, সব ক্ষমতা তো আল্লাহ্ তা'আলারই এবং সব কারণ সত্যিকারভাবে ক্রিয়াশীল নয়---) এ বিষয়ে মনস্তুষ্টি হয় না যে, আল্লাহ্ যদি চাইতেন, তবে (সারা বিশ্বের) সব মানুষকে হিদায়ত করে দিতেন? (কিন্তু কোন কোন

রহস্যের কারণে তিনি এরূপ চান না। অতএব সব মানুষ ঈমান আনবে না। এর বড় কারণ হঠকারিতা। এমতাবস্থায় হঠকারীদের ঈমানের চিন্তায় কেন পড়ে আছেন?) এবং (যখন ঠিক হয়ে গেল যে, এরা বিশ্বাস স্থাপন করবে না, তখন এরূপ ধারণা হতে পারে যে, তবে তাদের কেন শাস্তি দেওয়া হয় না? এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মক্কার) কাফিররা তো সর্বদাই (প্রায়ই) এ অবস্থায় থাকে যে, তাদের (কু) কীর্তির কারণে তাদের উপর কোন না কোন দুর্বিপাক আসতে থাকে (কোথাও হত্যা; কোথাও বন্দীত্ব এবং কোথাও পরাজয় ও বিপর্যয়) অথবা কোন কোন দুর্বিপাক (তাদের উপর না আসলেও) তাদের জনপদের নিকটবর্তী স্থানে নাযিল হতে থাকে (উদাহরণত কোন সম্প্রদায়ের উপর বিপদ আসল। এতে শংকিত হল যে, আমাদের উপরও বিপদ না এসে যায়)। এমনকি, (এমতাবস্থায়ই) আল্লাহ্‌র ওয়াদা এসে যাবে। (অর্থাৎ তারা পরকালীন আযাবের সম্মুখীন হয়ে যাবে, যা মৃত্যুর পর শুরু হয়ে যাবে। এবং) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ওয়াদার খেলাফ করেন না। (অতএব আযাব যে তাদের উপর পড়বে, তা নিশ্চিত, যদিও মাঝে মাঝে কিছু দেরী হতে পারে।) এবং (তারা আপনার সাথেই বিশেষভাবে মিথ্যারোপ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের আচরণ করে না, এমনিভাবে আযাবে বিলম্ব হওয়াও বিশেষভাবে তাদের বেলায় নয়; বরং পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ ও তাঁদের কওমের বেলায় এরূপ হয়েছে। সেমতে) আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের সাথে (কাফিরদের পক্ষ থেকে) ঠাট্টা-বিদ্রূপ হয়েছে। অতঃপর আমি কাফিরদেরকে কিছু অবকাশ দিয়েছি। অতঃপর আমি তাদের পাকড়াও করেছি। অতএব (চিন্তার বিষয় যে) আমার আযাব কিরূপ ছিল! (অর্থাৎ খুবই কঠোর ছিল। যখন জানা গেল যে, আল্লাহ্‌ই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তখন তা জানা ও প্রমাণিত হওয়ার পরও) যে (আল্লাহ্) প্রত্যেক ব্যক্তির কাজকর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত, সে এবং তাদের শরীকরা সমান হতে পারে কি? এবং (এতদসত্ত্বেও) তারা আল্লাহ্‌র জন্য অংশীদার স্থির করেছে। আপনি বলুন: তাদের (অর্থাৎ শরীকদের) নাম তো বল, (যাতে আমিও শুনি, তারা কে এবং কেমন?) তোমরা কি (তাদেরকে সত্যিকার শরীক মনে করে দাবী কর? তাহলে তো বোঝা যায় যে,) আল্লাহ্ তা'আলাকে এমন বিষয়ের খবর দিচ্ছ যে, (সারা) দুনিয়ায় তার (অস্তিত্বের) খবর আল্লাহ্ তা'আলারই জানা ছিল না। (কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ঐ বস্তুকেই অস্তিত্বশীল জানেন, বাস্তবে যার অস্তিত্ব আছে এবং অনস্তিত্বশীলকে তিনি অস্তিত্বশীল জানেন না। কেননা, তাতে জ্ঞানের ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে; যদিও প্রকাশ উভয়টির সমান। মোটকথা, তাদেরকে সত্যিকার শরীক বললে এ অসম্ভব বিষয়টি জরুরী হয়ে যায়। কাজেই তাদের শরীক হওয়াই অসম্ভব। অথবা (তাদেরকে সত্যিকার শরীক বল না; বরং) শুধু বাহ্যিক ভাষার দিক দিয়ে শরীক বল (বাস্তবে এর কোন প্রতীক নেই। তাহলে তারা যে শরীক নয়---একথা তোমরা নিজেরাই স্বীকার করছ। সুতরাং তারা যে শরীক নয়---একথা উভয় অবস্থাতেই প্রমাণিত হয়ে গেল। প্রথম অবস্থায় যুক্তির মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় তোমাদের স্বীকৃতির মাধ্যমে। এ বক্তব্যটি যদিও উচ্চতম পর্যায়ে যথেষ্ট, কিন্তু তারা তা মানবে না)। বরং কাফিরদের কাছে তাদের বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা (যার ভিত্তিতে তারা শিরকে লিপ্ত আছে) সুন্দর মনে হয় এবং (এ কারণেই) তারা (সৎ) পথ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে এবং

(আসল কথা তাই, যা পূর্ববর্ণিত بَلِ لِلّٰهِ الْاَمْرُ বাক্য থেকে জানা গেছে। অর্থাৎ) যাকে আল্লাহ্ তা'আলা পথভ্রষ্টতায় রাখেন, তাকে পথে আনার কেউ নেই। (তবে তিনি তাকেই পথভ্রষ্ট রাখেন, যে সত্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠার পরও একগুঁয়েমি করে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মক্কার মুশরিকদের সামনে ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সত্য রসূল হওয়ার নিদর্শনাবলী তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের এবং বিস্ময়কর মু'জিযার মাধ্যমে দিবালোকের মত ফুটে উঠেছিল। তাদের সর্দার আবূ জাহ্ল বলে দিয়েছিল যে, বনূ হাশিমের সাথে আমাদের পারিবারিক প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। আমরা তাদের এ শ্রেষ্ঠত্ব কিরূপে স্বীকার করতে পারি যে, আল্লাহ্র রসূল তাদের মধ্য থেকে আগমন করেছেন ? তাই তিনি যাই বলুন না কেন এবং যত নিদর্শনই প্রদর্শন করুন না কেন, আমরা কোন অবস্থাতেই তাকে বিশ্বাস করব না। এজন্যই সে বাজে ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ ও অবান্তর ফরমায়েশের মাধ্যমে সর্বত্র এ হঠকারিতা প্রকাশ করত। আলোচ্য আয়াতসমূহও আবূ জাহ্ল ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের এক প্রশ্নের উত্তরে নাযিল হয়েছে।

তফসীর বগভীতে আছে, একদিন মক্কার মুশরিকরা পবিত্র কাবা প্রাঙ্গণে এক সভায় মিলিত হল। তাদের মধ্যে আবূ জাহ্ল ও আবদুল্লাহ্ ইবনে উমাইয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা আবদুল্লাহ্ ইবনে উমাইয়াকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে প্রেরণ করল। সে বললঃ আপনি যদি চান যে, আমরা আপনাকে রসূল বলে স্বীকার করে নেই এবং আপনার অনুসরণ করি, তবে আমাদের কতগুলো দাবী আছে এগুলো কোরআনের মাধ্যমে পূরণ করে দিলে আমরা সবাই মুসলমান হয়ে যাব।

তাদের একটি দাবী ছিল এই যে, মক্কা শহরটি খুবই সংকীর্ণ। চতুর্দিক থেকে পাহাড়ে ঘেরা উচ্চভূমি, যাতে না চাষাবাদের সুযোগ আছে এবং না বাগবাগিচা ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের অবকাশ আছে। আপনি মু'জিযার সাহায্যে পাহাড়গুলোকে দূরে সরিয়ে দিন--- যাতে মক্কার জমিন প্রশস্ত হয়ে যায়। আপনিই তো বলেন যে, দাউদ (আ)-এর জন্য পাহাড়ও সাথে সাথে তসবীহ্ পাঠ করত। আপনার কথা অনুযায়ী আপনি তো আল্লাহ্র কাছে দাউদের চাইতে খাটো নন।

দ্বিতীয় দাবী ছিল এই যে, আপনার কথা অনুযায়ী সুলায়মান (আ)-এর জন্য যেরূপ বায়ুকে আজ্ঞাবহ করে পথের বিরাট বিরাট দূরত্বকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল, আপনিও আমাদের জন্য তদ্রূপ করে দিন---যাতে সিরিয়া ইয়ামানের সফর আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়।

তৃতীয় দাবী ছিল এই যে, ঈসা (আ) মৃতদেরকে জীবিত করতেন। আপনি তাঁর চাইতে কোন অংশে কম নন। আপনিও আমাদের জন্য আমাদের দাদা কুসাইকে জীবিত করে দিন---যাতে আমরা তাকে জিজ্ঞেসা করি যে, আপনার ধর্ম সত্য কি না। (মাযহারী, বগভী, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মরদুওয়াইহ্)

আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব হঠকারিতাপূর্ণ দাবীর উত্তরে বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ ۗ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ

এখানে تسيير جبال বলে পাহাড়গুলোকে স্বস্থান থেকে হটানো, قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ বলে সংক্ষিপ্ত সময়ে লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করা এবং كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ বলে মৃতদেরকে জীবিত করে কথা বলা বোঝানো হয়েছে। لو حرف شرط-এর জওয়াব স্থানের ইঙ্গিতে উহ্য রয়েছে ; অর্থাৎ لَمَا آمَنُوا যেমন কোরআনের অন্য এক জায়গায় এমনি বিষয়বস্তু এবং তার এরূপ জওয়াবই উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا

অর্থ এই যে, যদি কোরআনের সাহায্যে তাদের এসব দাবী পূরণ করে দেওয়া হয়, তবুও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। কেননা, তারা এসব দাবীর পূর্বে এমন এমন মু'জিযা প্রত্যক্ষ করেছে, যেগুলো তাদের প্রার্থিত মু'জিযার চাইতে অনেক উর্ধ্বে ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইশারায় চন্দ্রের দ্বিখণ্ডিত হওয়া পাহাড়ের স্বস্থান থেকে সরে যাওয়া এবং বায়ুকে আজ্ঞাবহ করার চাইতে অনেক বেশী বিস্ময়কর। এমনিভাবে তাঁর হাতে নিষ্প্রাণ কংকরের কথা বলা এবং তসবীহ পাঠ করা কোন মৃত ব্যক্তির জীবিত হয়ে কথা বলার চাইতে অধিকতর বিরাট মু'জিযা। শবে মি'রাজে মসজিদে আকসা, অতঃপর সেখানে থেকে নভোমণ্ডলের সফর এবং সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রত্যাবর্তন, বায়ুকে বশ করা সুলায়মানী তখতের আলৌকিকতার চাইতে অনেক মহান। কিন্তু জালিমরা এগুলো দেখার পরও বিশ্বাস স্থাপন করেনি। অতএব এসব দাবীর পেছনেও তাদের নিয়ত যে টালবাহানা করা---কিছু মেনে নেওয়া ও করা নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মুশরিকদের এ সব দাবীর লক্ষ্য এটাই ছিল যে, তাদের দাবী পূরণ না করা হলে তারা বলবে ঃ (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'আলাই এ সব কাজ করার শক্তি রাখেন না, অথবা রসূলের কথা আল্লাহ্র কাছে শ্রবণযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। এতে বোঝা যায় যে, তিনি আল্লাহ্র রসূল নন। তাই অতঃপর বলা হয়েছে ঃ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

অর্থাৎ ক্ষমতা সবটুকু আল্লাহ্ তা'আলারই। উদ্দেশ্য এই যে, উল্লিখিত দাবীগুলো পূরণ না করার কারণ এই নয় যে, এগুলো আল্লাহ্র শক্তি বহির্ভূত; বরং বাস্তব সত্য এই যে, জগতের মঙ্গলামঙ্গল একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি স্বীয় রহস্যের কারণে এ সব দাবী পূর্ণ করা উপযুক্ত মনে করেন নি। কারণ, দাবী উত্থাপনকারীদের হঠকারিতা ও বদনিয়ত তাঁর জানা আছে। তিনি জানেন যে, এসব দাবী পূরণ করা হলেও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

أَفَلَمْ يَايْئَسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا

ইমাম বগভী বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কিরাম মুশরিকদের এসব দাবী শুনে কামনা করতে থাকেন যে, মু'জিযা হিসেবে দাবীগুলো পূরণ করে দিলে ভালই হয়। মক্কার সবাই মুসলমান হয়ে যাবে এবং ইসলাম শক্তিশালী হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থ এই যে, মুসলমানরা মুশরিকদের ছলচাতুরী ও হঠকারিতা দেখা ও জানা সত্ত্বেও কি এখন পর্যন্ত তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়নি যে, এমন কামনা করতে শুরু করেছে? অথচ তারা জানে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে সব মানুষকে এমন হিদায়েত দিতে পারেন যে, মুসলমান হওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকবে না। কিন্তু সবাইকে ইসলাম ও ঈমানে বাধ্য করা আল্লাহ্র রহস্যের অনুকূলে নয়; আল্লাহ্র রহস্য এটাই যে, প্রত্যেকের নিজস্ব ক্ষমতা অটুট থাকুক এবং এ ক্ষমতাবলে ইসলাম গ্রহণ করুক অথবা কুফল অবলম্বন করুক।

وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ

—হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন قَارِعَةٌ শব্দের অর্থ আপদ-বিপদ। আয়াতের অর্থ এই যে, মুশরিকদের দাবী-দাওয়া পূরণ করার কারণ এই যে, তাদের বদনিয়ত ও হঠকারিতা জানা ছিল যে, পূরণ করলেও বিশ্বাস স্থাপন করবে না। তারা আল্লাহ্র কাছে দুনিয়াতেও আপদ-বিপদে পতিত হওয়ার যোগ্য; যেমন মক্কাবাসীদের উপর কখনও দুর্ভিক্ষের কখনও ইসলামী জিহাদ তথা বদর, ওহুদ ইত্যাদিতে হত্যা ও বন্দীত্বের বিপদ নাযিল হয়েছে। কারও উপরও বজ্র পতিত হয়েছে এবং কেউ অন্য কোন বালা-মুসীবতে আক্রান্ত হয়েছে।

أَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ অর্থাৎ মাঝে মাঝে এমনও হবে যে, সরাসরি তাদের উপর বিপদ আসবে না; বরং তাদের নিকটবর্তী জনপদের উপর বিপদ আসবে যাতে তারা শিক্ষা লাভ করে এবং নিজেদের কুপরিণামও দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

حَتّٰى يَأْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ —অর্থাৎ আপদ-বিপদের এ ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা পূর্ণ না হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহ্র ওয়াদা কোন সময় টলতে পারে না। ওয়াদা বলে এখানে মক্কা বিজয়

বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার আপদ আসতে থাকবে। এমন কি, পরিশেষে মক্কা বিজিত হবে এবং তারা সবাই পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে যাবে।

আলোচ্য আয়াতে أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ বাক্য থেকে জানা যায় যে, কোন সম্প্রদায় ও জনপদের আশেপাশে আযাব অথবা বিপদ নাযিল হলে তাতে আল্লাহ্ তা'আলার এ রহস্যও নিহিত থাকে যে, পার্শ্ববর্তী জনপদগুলোও হুঁশিয়ার হয়ে যায় এবং অন্যের দুরবস্থা দেখে তারাও নিজেদের ক্রিয়াকর্ম সংশোধন করে নেয়। ফলে অন্যের আযাব তাদের জন্য রহমত হয়ে যায়, নতুবা একদিন অন্যদের ন্যায় তারাও আযাবে পতিত হবে।

নিত্যদিনকার অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, আমাদের আশেপাশে প্রায়ই কোন না কোন সম্প্রদায় ও জনপদের উপর বিভিন্ন প্রকার আপদ-বিপদ আসছে। কোথাও বন্যার ধ্বংস-লীলা, কোথাও ঝড় ঝঞ্ঝা, কোথাও ভূমিকম্প এবং কোথাও যুদ্ধ-বিগ্রহ বা অন্য কোন বিপদ অহরহ আপতিত হচ্ছে। কোরআন পাকের উপরোক্ত বক্তব্য অনুযায়ী---এগুলো শুধু সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় ও জনপদের জন্যই শাস্তি নয়; বরং পার্শ্ববর্তী এলাকাবাসীদের জন্যও হুঁশিয়ারি সংকেত হয়ে থাকে। অতীতে যদিও জ্ঞান-বিজ্ঞান এতটুকু উন্নত ছিল না, কিন্তু মানুষের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় ছিল। কোথাও এ ধরনের দুর্ঘটনা দেখা দিলে স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যেত, আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করত তওবা করত এবং ইস্তেগফার ও দান-খয়রাতকে মুক্তির উপায় মনে করত। ফলে চাক্ষুষ দেখা যেত যে, তাদের বিপদ সহজেই দূর হয়ে গেছে। আজ আমরা এতই গাফিল হয়ে গেছি যে, বিপদের মুহূর্তেও আল্লাহ্ স্মরণে আসে না---বাকী সব কিছুই আমরা স্মরণ করি। দুনিয়ার তাবত অমুসলিমদের ন্যায় আমাদের দৃষ্টি কেবল বস্তুগত কারণাদির মধ্যেই নিবদ্ধ হয়ে থাকে। কারণাদির উদ্ভাবক আল্লাহ্র দিকে মনোযোগের তওফীক তখনও কম লোকেরই হয়। এরই ফলশ্রুতিতে বিশ্ব আজ একের পর এক উপর্যুপরি দুর্ঘটনার শিকার হতে থাকে।

حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝---অর্থাৎ কাফির ও মুশরিকদের উপর দুনিয়াতেও বিভিন্ন প্রকার আযাব ও আপদ-বিপদের ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা পৌঁছে না যায়। কেননা, আল্লাহ্ কখনও ওয়াদার খেলাফ করেন না।

ওয়াদার অর্থ এখানে মক্কা বিজয়। আল্লাহ্ তা'আলা এই ওয়াদা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে করে রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, পরিশেষে মক্কা বিজিত হয়ে কাফির ও মুশরিকরা পর্যুদস্ত হবেই; এর পূর্বেও অপরাধের কিছু কিছু সাজা তারা ভোগ করবে। ওয়াদার অর্থ এ স্থলে কিয়ামতও হতে পারে। এ ওয়াদা সব পয়গম্বরের সাথে সব সময়ই করা আছে। ওয়াদাকৃত সেই কিয়ামতের দিন প্রত্যেক কাফির ও অপরাধী কৃতকর্মের পুরাপুরি শাস্তি ভোগ করবে।

বর্ণিত ঘটনায় মুশরিকদের হঠকারিতাপূর্ণ প্রশ্নের কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দুঃখিত ও ব্যথিত হওয়ার আশংকা ছিল। তাই পরবর্তী আয়াতে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ
فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ -

আপনি যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন, তা শুধু আপনারই পরিস্থিতি নয়। আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও এমনি ধরনের অবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন। অপরাধী ও অবিশ্বাসীদেরকে তাদের অপরাধের কারণে তাৎক্ষণিকভাবে ধরা হয়নি। তারা পয়গম্বরগণের সাথে ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে করতে যখন চরম সীমায় পৌঁছে যায়, তখন আল্লাহ্র আযাব তাদেরকে পরিবেষ্টন করে এবং এমনভাবে বেষ্টন করে যে, রুখে দাঁড়াবার কারও শক্তি থাকেনি।

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ---এ আয়াতে মুশরিকদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, এরা এতই বোকা যে, নির্জীব ও চেতনাহীন প্রতিমাগুলোকে ঐ পবিত্র সত্তার সমতুল্য স্থির করে, যিনি প্রত্যেক ব্যক্তির রক্ষক ও তার ক্রিয়াকর্মের হিসাব গ্রহিতা। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ এর আসল কারণ এই যে, শয়তান তাদের মূর্খতাকেই তাদের দৃষ্টিতে সুশোভন করে রেখেছে। তারা একেই সাফল্যের চরম পরাকাষ্ঠা ও কৃতকার্যতা মনে করে।

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ
مِنْ وَّاقٍ ﴿٣٤﴾ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۖ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهٰرُ ۖ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا ۖ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۖ وَّعُقْبَى
الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ
وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ۖ قُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ
وَلَآ أُشْرِكَ بِهٖ ۖ إِلَيْهِ أَدْعُوْا وَإِلَيْهِ مَاٰبِ ﴿٣٦﴾ وَكَذٰلِكَ أَنْزَلْنٰهُ

حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ
مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ۝

(৩৪) দুনিয়ার জীবনেই এদের জন্য রয়েছে আযাব এবং অতি অবশ্য আখিরাতের জীবন কঠোরতম। আল্লাহ্‌র কবল থেকে তাদের কোন রক্ষাকারী নেই। (৩৫) পরহিযগারদের জন্য প্রতিশ্রুত জান্নাতের অবস্থা এই যে, তার নিম্নে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং ছায়াও। এটা তাদের প্রতিদান, যারা সাবধান হয়েছে এবং কাফিরদের প্রতিফল অগ্নি। (৩৬) এবং যাদেরকে আমি গ্রন্থ দিয়েছি, তারা আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তজ্জন্য আনন্দিত হয় এবং কোন কোন দল এর কোন কোন বিষয় অস্বীকার করে। বলুন, আমাকে এরূপ আদেশই দেওয়া হয়েছে যে, আমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করি। এবং তাঁর সাথে অংশীদার না করি। আমি তাঁর দিকেই দাওয়াত দেই এবং তাঁর কাছেই আমার প্রত্যাবর্তন। (৩৭) এমনিভাবেই আমি এ কোরআনকে আরবী ভাষায় নির্দেশরূপে অবতারণ করেছি। যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন আপনার কাছে জ্ঞান পৌঁছার পর, তবে আল্লাহ্‌র কবল থেকে আপনার না কোন সাহায্যকারী আছে এবং না কোন রক্ষাকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কাফিরদের জন্য পার্থিব জীবনে (৩) শাস্তি রয়েছে (তা হচ্ছে হত্যা, বন্দীত্ব, অপমান অথবা রোগ-শোক ও বিপদাপদ)। এবং পরকালের শাস্তি এর চাইতে অনেক বেশী কঠোর (কেননা তা যেমন তীব্র, তেমনি চিরস্থায়ীও) এবং আল্লাহ্‌র (আযাব) থেকে তাদেরকে রক্ষাকারী কেউ হবে না (এবং) যে জান্নাতের ওয়াদা পরহিযগারদের সাথে (অর্থাৎ কুফর ও শিরক থেকে আত্মরক্ষাকারীদের সাথে) করা হয়েছে, তার অবস্থা এই যে, তার (দালান-কোঠা ও বৃক্ষাদির) তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে এবং ফল ও ছায়া সদা-সর্বদা থাকবে। এটা তো পরহিযগারদের পরিণাম এবং কাফিরদের পরিণাম হবে দোযখ। আর যাদেরকে আমি (ঐশী) গ্রন্থ (অর্থাৎ তওরাত ও ইন্‌জীল) দিয়েছি (এবং তারা তা পুরোপুরি মেনে চলত) তারা এ গ্রন্থের কারণে আনন্দিত হয়েছে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। (কেননা তারা তাদের গ্রন্থে এর খবর পায়। তারা আনন্দিত হয়ে একে মেনে নেয় এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে; যেমন ইহুদীদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গীরা এবং খৃস্টানদের মধ্যে নাজ্জাশী ও তাঁর প্রেরিত লোকগণ। অন্যান্য আয়াতেও তাদের কথা উল্লিখিত আছে)। এবং তাদের দলের মধ্যেই কেউ কেউ এমন যে, এর (অর্থাৎ এ গ্রন্থের) কোন কোন অংশ (যাতে তাদের গ্রন্থের বিরুদ্ধে বিধানাবলী আছে) অস্বীকার করে (এবং কুফরী করে)। আপনি (তাদেরকে) বলুনঃ (বিধানাবলী দু'প্রকার মৌলিক ও শাখাগত। তোমরা যদি মৌলিক বিধানাবলীতে বিরুদ্ধাচরণ কর, তবে সেগুলো

সব শরীয়তে অভিন্ন। সেমতে) আমি (তওহীদ সম্পর্কে) আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করি এবং কাউকে তাঁর অংশীদার না করি (এবং নবুয়তের সম্পর্কে এই যে) আমি (মানুষকে) আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেই (অর্থাৎ নবুয়তের সারমর্ম এই যে, আমি আল্লাহ্‌র দিকে আহবানকারী) এবং (পরকাল সম্পর্কে আমার বিশ্বাস এই যে) তাঁর দিকেই আমাকে (দুনিয়া থেকে ফিরে) যেতে হবে। (অর্থাৎ এ তিনটি হচ্ছে মূলনীতি। এদের একটিও অস্বীকারোপযোগী নয়। তওহীদ সবার কাছে স্বীকৃত। অন্য আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا الخ ব্যক্ত করা হয়েছে। নবুয়তের ব্যাপারে আমি নিজের জন্য অর্থকড়ি ও নামযশ চাই না, যদ্দরুন অস্বীকারের অবকাশ হবে---শুধু আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেই। পূর্বেই এরূপ ব্যক্তি আবির্ভূত হয়েছেন, যাদেরকে তোমরাও স্বীকার কর। এ বিষয়বস্তুটিই অন্যত্র مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ الخ আয়াতে বিধৃত হয়েছে। এমনি-ভাবে পরকালের বিশ্বাস অভিন্ন, স্বীকৃত ও অনস্বীকার্য। পক্ষান্তরে যদি তোমরা শাখাগত বিধানে বিরোধী হও, তবে এর জওয়াব আল্লাহ্ তা'আলা দেন যে, আমি যেভাবে অন্যান্য পয়গম্বরকে বিশেষ বিশেষ ভাষায় বিধান দান করেছি) এমনিভাবে আমি এ (কোরআন) কে এভাবে নাযিল করেছি যে, এটা আরবী ভাষায় বিশেষ বিধান। (আরবী বলায় অন্যান্য পয়গম্বরের অন্যান্য ভাষার প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে এবং ভাষার পার্থক্য দ্বারা উম্মতের পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে। অতএব জওয়াবের সারমর্ম এই যে, শাখাগত বিধানে পার্থক্য উম্মতের পার্থক্যের কারণ হয়েছে। কেননা, প্রতি যুগের উম্মতের উপযোগিতা ছিল বিভিন্নরূপ। সুতরাং শরীয়তসমূহের পার্থক্য বিরুদ্ধাচরণের কারণ হতে পারে না। স্বয়ং তোমাদের সর্বজনস্বীকৃত শরীয়তসমূহেও শাখাগত পার্থক্য হয়েছে। এমতাবস্থায় তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ ও অস্বীকারের কি অবকাশ আছে?) এবং [হে মুহাম্মদ (সা)] যদি আপনি (অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে) তাদের মানসিক প্রবৃত্তি (অর্থাৎ রহিত বিধানা-বলী অথবা পরিবর্তিত বিধানাবলী) অনুসরণ করেন আপনার কাছে (উদ্দিষ্ট বিধানা-বলীর বিশুদ্ধ) জ্ঞান পৌঁছার পর, তবে, আল্লাহ্‌র কবল থেকে আপনার না কোন সাহায্যকারী হবে এবং না কোন উদ্ধারকারী হবে। (যখন পয়গম্বরকে এমন সম্বোধন করা হচ্ছে, তখন অন্য লোকেরা অস্বীকার করে কোথায় যাবে? এতে গ্রন্থধারীদের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং উভয় অবস্থাতেই অস্বীকারকারীও বিরুদ্ধাচরণকারীদের জওয়াব হয়ে গেছে।)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾ وَإِن

مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ
وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ
أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝
وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ
كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِنْدَهُ
عِلْمُ الْكِتَابِ ۝

(৩৮) আপনার পূর্বে আমি অনেক রসূল প্রেরণ করেছি এবং তাঁদেরকে পত্নী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। কোন রসূলের এমন সাধ্য ছিল না যে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করে। প্রত্যেকটি ওয়াদা লিখিত আছে। (৩৯) আল্লাহ্ যা ইচ্ছা, মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন এবং মূলগ্রন্থ তাঁর কাছেই রয়েছে। (৪০) আমি তাদের সাথে যে ওয়াদা করেছি, তার কোন একটি যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই কিংবা আপনাকে উঠিয়ে নেই, তাতে কি---আপনার দায়িত্ব তো পৌঁছে দেওয়া এবং আমার দায়িত্ব হিসাব নেওয়া। (৪১) তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে সমানে সংকুচিত করে আসছি? আল্লাহ্ নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন। (৪২) তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা চক্রান্ত করেছে। আর সকল চক্রান্ত তো আল্লাহ্‌র হাতেই আছে। তিনি জানেন প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু করে। কাফিররা জেনে নেবে যে, পর জীবনের আবাসস্থল কাদের জন্য রয়েছে। (৪৩) কাফিররা বলে ঃ আপনি প্রেরিত ব্যক্তি নন। বলে দিন, আমার ও তোমাদের মধ্যে প্রকৃষ্ট সাক্ষী হচ্ছেন আল্লাহ্ এবং ঐ ব্যক্তি, যার কাছে গ্রন্থের জ্ঞান আছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (গ্রন্থধারীদের মধ্যে কেউ কেউ যে পয়গম্বরের প্রতি দোষারোপ করে তাঁর অনেক পত্নী রয়েছে, এর জওয়াব এই যে) আমি নিশ্চিতই আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে পত্নী ও সন্তান-সন্ততিও দিয়েছি (এটা পয়গম্বরীর পরিপন্থী বিষয় হল কিরূপে? এমন বিষয়বস্তু অন্য একটি আয়াতেও এভাবে উল্লিখিত হয়েছে ঃ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ

عَلٰى مَا اَتٰهُمُ اللّٰهُ) এবং (শরীয়তসমূহের পার্থক্যের সন্দেহটি অন্যান্য সন্দেহের চাইতে ছিল অধিক আলোচিত এবং পূর্বে খুব সংক্ষেপে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল, তাই পরবর্তী আয়াতে একে পুনর্বারও বিস্তারিত উল্লেখ করা হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি নবীর বিরুদ্ধে শরীয়তসমূহের পার্থক্যের প্রশ্ন তোলে, সে পরোক্ষভাবে নবীকে বিধানের মালিক মনে করে। অথচ কোন পয়গম্বরের ক্ষমতা নেই যে, একটি আয়াত (অর্থাৎ একটি বিধান) আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া (নিজের পক্ষ থেকে) উপস্থিত করতে পারে। (বরং বিধানাবলী নির্ধারিত হওয়া আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং আল্লাহ্‌র রহস্য ও উপযোগিতার দিক দিয়ে এরূপ রীতি আছে যে) প্রত্যেক যুগের উপযোগী বিশেষ বিশেষ বিধান হয় (এরপর অন্য যুগে কোন কোন ব্যাপারে অন্য বিধান আসে এবং পূর্ববর্তী বিধান মওকুফ হয়ে যায়। অবশ্য কোন কোন বিধান হুবহু বহাল থাকে। সুতরাং) আল্লাহ্ তা'আলা (-ই) যে বিধানকে ইচ্ছা মওকুফ করে দেন এবং যে বিধানকে ইচ্ছা বহাল রাখেন এবং মূল গ্রন্থ (অর্থাৎ লওহে মাহফুয) তাঁর কাছেই রয়েছে। (সব মওকুফকারী, মওকুফ ও প্রচলিত বিধান তাতে লিপিবদ্ধ আছে। সেটি সর্বাত্মক এবং যেন মূল ভাণ্ডার। অর্থাৎ যে স্থান থেকে এসব বিধান আসে, সে আল্লাহ্ তা'আলারই অধিকারভুক্ত। কাজেই সাবেক বিধানের অনুকূল কিংবা প্রতিকূল বিধান আনার ক্ষমতাও অবশ্যই কারও হতে পারে না।) এবং (তারা যে এ কারণে নবুয়ত অস্বীকার করে যে, আপনি নবী হলে নবুয়ত অস্বীকার করার কারণে যে আযাবের ওয়াদা করা হয়, তা নাযিল হয় না কেন? সে সম্পর্কে শুনে নিন) যে বিষয়ের (অর্থাৎ আযাবের) ওয়াদা আমি তাদের সাথে (নবুয়ত অস্বীকার করার কারণে) করেছি, যদি তার কিয়দংশ আমি আপনাকে দেখাই (অর্থাৎ আপনার জীবদ্দশায় কোন আযাব তাদের উপর নাযিল হয়ে যায়) কিংবা (আযাব নাযিল হওয়ার আগে) আমি আপনাকে ওফাত দান করি (এবং পরে আযাব নাযিল হয়---দুনিয়াতে হোক কিংবা পরকালে, উভয় অবস্থাতেই আপনি চিন্তিত হবেন না। কেননা) আপনার দায়িত্ব শুধু (বিধানাবলী) পৌঁছে দেওয়া এবং হিসাব নেওয়া আমার কাজ। আপনি কেন চিন্তিত হবেন যে, আযাব এসে গেলে সম্ভবত বিশ্বাস স্থাপন করত। আশ্চর্যের বিষয়, তারাও কুফরীর কারণে আযাব আসার কথা কিরূপে সোজাসুজি অস্বীকার করছে! তারা কি (আযাবের প্রথমাংশের মধ্য থেকে) এ বিষয়টি দেখছে না যে, আমি (ইসলামের বিজয়ের মাধ্যমে তাদের) দেশকে চতুর্দিক থেকে সমানে হ্রাস করে আনছি (অর্থাৎ ইসলামী বিজয়ের অগ্রগতির কারণে তাদের শাসনাধীন এলাকা দিন দিনই কমে আসছে। এটাও তো এক প্রকার আযাব---যা আসল আযাবের প্রথমাংশ ; যেমন অন্য আয়াতে আছে وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنٰى

دُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ) এবং আল্লাহ্ যা চান, আদেশ করেন। তাঁর আদেশকে রদ করার কেউ নেই। (সুতরাং ছোট কিংবা বড়, যে আযাবই হোক, তাকে তাদের শরীক কিংবা

অন্য কেউ খণ্ডন করতে পারে না) এবং (যদি তারা কিছু সময়ও পায়, তাতে কি) তিনি খুব দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (সময় আসার অপেক্ষা মাত্র। এরপর তৎক্ষণাৎ প্রতিশ্রুত সাজা শুরু হয়ে যাবে) এবং (এরা যে রসূল-পীড়ন কিংবা ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার কাজে নানা রকম কলাকৌশল অবলম্বন করছে, এতে কিছু আসে যায় না। সেমতে তাদের) পূর্বে যারা (কাফির) ছিল, তারা (ও এসব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য) বড় বড় চক্রান্ত করেছে। অতএব (কিছুই হয়নি। কেননা) আসল কলাকৌশল তো আল্লাহ্ তা'আলারই। (তাঁর সামনে কারও কলাকৌশল চলে না। তাই আল্লাহ্ তাদের কলাকৌশল ব্যর্থ করে দিয়েছেন।) এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু করে, তিনি সব জানেন। (এরপর সময়মত তাকে শাস্তি দেন) এবং (এমনিভাবে কাফিরদের কাজ-কর্মও তিনি সব জানেন। অতএব) কাফিররা সত্বরই জানতে পারবে যে, এ জগতে সুপরিণাম কার ভাগে রয়েছে? (তাদের না মুসলমানদের? অর্থাৎ সত্বরই তারা স্বীয় মন্দ পরিণাম ও কর্মের শাস্তি জানতে পারবে।) এবং কাফিররা (এসব শাস্তি বিস্মৃত হয়ে) বলে ঃ (নাউযুবিল্লাহ) আপনি পয়গম্বর নন। আপনি বলে দিন ঃ (তোমাদের অর্থহীন অস্বীকারে কি হয়) আমার ও তোমাদের মধ্যে (আমার নবুয়ত সম্পর্কে) আল্লাহ্ তা'আলা এবং ঐ ব্যক্তি, যার কাছে (ঐশী) গ্রন্থের জ্ঞান আছে (যাতে আমার নবুয়তের সত্যায়ন আছে) প্রকৃষ্ট সাক্ষী। (অর্থাৎ কিতাবী সম্প্রদায়ের ঐসব আলিম, যারা ন্যায়-পরায়ণ ছিলেন এবং নবুয়তের ভবিষ্যদ্বাণী দেখে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, আমার নবুয়তের দুটি প্রমাণ আছে ঃ যুক্তিগত ও ইতিহাসগত। যুক্তিগত প্রমাণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নবুয়তের প্রমাণ হিসাবে মু'জিযা দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষী হওয়ার অর্থ তাই। ইতিহাসগত প্রমাণ এই যে, পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থসমূহে এর সংবাদ বিদ্যমান রয়েছে। বিশ্বাস না হলে ন্যায়পরায়ণ আলিমদের কাছে জিজ্ঞেস কর। তারা প্রকাশ করে দেবেন। অতএব, যুক্তিগত ও ইতিহাসগত প্রমাণাদি সত্ত্বেও নবুয়ত অস্বীকার করা দুর্ভাগ্য বৈ কিছু নয়। কোন বুদ্ধিমানের এ ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া উচিত নয়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নবী-রসূল সম্পর্কে কাফির ও মুশরিকদের একটি সাধারণ ধারণা ছিল এই যে, তাদের মানুষ ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টজীব যেমন ফেরেশতা হওয়া দরকার। ফলে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিতর্কের উর্ধ্বে থাকবে। কোরআন পাক তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জওয়াব একাধিক আয়াতে দিয়ে বলেছে যে, তোমরা নবুয়ত-রিসালতের স্বরূপ ও রহস্যই বোঝনি। ফলে এ ধরনের কল্পনায় মেতে উঠেছ। রসূলকে আল্লাহ্ তা'আলা একটি আদর্শ হিসাবে প্রেরণ করেন, যাতে উম্মতের সবাই তাঁর অনুসরণ করে এবং তাঁর মতই কাজকর্ম ও চরিত্র শিক্ষা করে। বলা বাহুল্য, মানুষ তার স্বজাতীয় মানুষেরই অনুসরণ করতে পারে। স্বজাতীয় নয়---এরূপ কোন অমানবের অনুসরণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব-পর নয়। উদাহরণত ফেরেশতার ক্ষুধা নেই, পিপাসা নেই এবং মানসিক প্রবৃত্তির সাথেও তার কোন সম্পর্ক নেই। তার নিদ্রা আসে না এবং গৃহেরও প্রয়োজন নেই। এমতাবস্থায় মানুষকে তার অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হলে তা সাধ্যাতীত কাজের নির্দেশ হয়ে যেত। এখানেও মুশরিকদের পক্ষ থেকে এ আপত্তিই উত্থাপিত হল। বিশেষ করে রসূলুল্লাহ্

(সা)-র বহু বিবাহ থেকে তাদের এ সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। এর জওয়াব প্রথম আয়াতের বাক্যগুলোতে দেওয়া হয়েছে যে, এক অথবা একাধিক বিবাহ করা এবং স্ত্রী-পুত্র পরিজন বিশিষ্ট হওয়াকে তোমরা কোন্ প্রমাণের ভিত্তিতে নবুয়ত ও রিসালতের পরিপন্থী মনে করে নিয়েছ? সৃষ্টির আদিকাল থেকেই আল্লাহ্ তা'আলার চিরন্তন রীতি এই যে, তিনি পয়গম্বরদেরকে পরিবার-পরিজন বিশিষ্ট করেছেন। অনেক পয়গম্বর অতিক্রান্ত হয়েছেন এবং তাদের মধ্যে অনেকের নবুয়তের প্রবক্তা তোমরাও। তাদের সবাই একাধিক পত্নীর অধিকারী ছিলেন এবং তাদের সন্তানাদিও ছিল। অতএব একে নবুয়ত, রিসালাত অথবা সাধুতা ও ওলী হওয়ার খেলাফ মনে করা মূর্খতা বৈ নয়।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমি তো রোযাও রাখি এবং রোযা ছাড়াও থাকি; (অর্থাৎ আমি এমন নই যে, সব সময়ই রোযা রাখব)। তিনি আরও বলেন ঃ আমি রাত্রিতে নিদ্রাও যাই এবং নামাযের জন্য দণ্ডায়মানও হই; (অর্থাৎ এমন নই যে, সারা রাত কেবল নামাযই পড়ব)। এবং মাংসও ভক্ষণ করি এবং নারীদেরকে বিবাহও করি। যে ব্যক্তি আমার এ সুন্নতকে আপত্তিকর মনে করে, সে মুসলমান নয়।

مَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ—অর্থাৎ কোন রসূলের এ ক্ষমতা নেই যে, সে আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া একটি আয়াতও নিজে আনতে পারে।

কাফির ও মুশরিকরা সদাসর্বদা যেসব দাবী পয়গম্বরদের সামনে করে এসেছে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনেও সমসাময়িক মুশরিকরা যে সব দাবী করেছে, তন্মধ্যে দুটি দাবী ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। এক. আল্লাহ্র কিতাবে আমাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী বিধি-বিধান অবতীর্ণ হোক। যেমন সূরা ইউনুসে তাদের এ আবেদন উল্লিখিত আছে যে,

اِئْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ—অর্থাৎ আপনি বর্তমান কোরআনের পরিবর্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোরআন আনুন, যাতে আমাদের প্রতিমাসমূহের উপাসনা নিষিদ্ধ করা না হয় অথবা আপনি নিজেই এর আনীত বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দিন---আযাবের জায়গায় রহমত এবং হারামের জায়গায় হালাল করে দিন।

দুই. পয়গম্বরদের সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখা সত্ত্বেও নতুন নতুন মু'জিযা দাবী করে বলা যে, অমুক ধরনের মু'জিযা দেখালে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। কোরআন পাকের উপরোক্ত বাক্যে اٰيَةٍ শব্দ দ্বারা উভয় অর্থই হতে পারে। কারণ কোরআনের পরিভাষায় কোরআনের আয়াতকেও আয়াত বলা হয় এবং মু'জিযাকেও। এ কারণেই 'এ আয়াত' শব্দের ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরবিদ কোরআনী আয়াত অর্থ ধরে উদ্দেশ্য এরূপ ব্যক্ত করেছেন যে, কোন পয়গম্বরের এরূপ ক্ষমতা নেই যে, নিজের পক্ষ থেকে কোন আয়াত তৈরী করে নেবেন। কেউ কেউ এ আয়াতের অর্থ মু'জিযা ধরে ব্যাখ্যা করেছেন যে, কোন রসূল ও নবীকে আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ ক্ষমতা দেননি যে, যখন ইচ্ছা, যে ধরনের

ইচ্ছা মু'জিযা প্রকাশ করেন। তফসীর রুহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, عموم مجاز এর ফায়দা অনুযায়ী এখানে উভয়বিধ অর্থ হতে পারে এবং উভয় তফসীর বিশুদ্ধ হতে পারে।

এদিক দিয়ে আলোচ্য আয়াতের সার বিষয়বস্তু এই যে, আমার রসূলের কাছে কোরআনী আয়াত পরিবর্তন করার দাবী অন্যায় ও ভ্রান্ত। আমি কোন রসূলকে এরূপ ক্ষমতা দেইনি। এমনিভাবে কোন বিশেষ ধরনের মু'জিযা দাবী করাও নবুয়তের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। কেননা, কোন নবী ও রসূলের এরূপ ক্ষমতা থাকে না যে, লোকদের খাহেশ অনুযায়ী মু'জিযা প্রদর্শন করবেন।

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ এখানে اجل শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট সময় ও মেয়াদ, كتاب শব্দটি এখানে ধাতু। এর অর্থ লিখা। বাক্যের অর্থ এই যে, প্রত্যেক বস্তুর মেয়াদ ও পরিমাণ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে লিখিত আছে। তিনি সৃষ্টির সূচনালগ্নে লিখে দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং এতদিন জীবিত থাকবে। কোথায় কোথায় যাবে, কি কি কাজ করবে এবং কখন ও কোথায় মরবে, তাও লিখিত আছে।

এমনিভাবে একথাও লিখিত আছে যে, অমুক যুগে অমুক পয়গম্বরের প্রতি কি ওহী এবং কি কি বিধি-বিধান অবতীর্ণ হবে। কেননা, প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক জাতির উপযোগী বিধি-বিধান আসতে থাকাই যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়ানুগ। আরও লিখিত আছে যে, অমুক পয়গম্বর দ্বারা অমুক সময়ে এই এই মু'জিযা প্রকাশ পাবে।

তাই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এরূপ দাবী করা যে, অমুক ধরনের বিধি-বিধান পরিবর্তন করান অথবা অমুক ধরনের মু'জিযা দেখান---এটি একটি হঠকারিতাপূর্ণ ও ভ্রান্ত দাবী, যা রিসালত ও নবুয়তের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতার ওপর ভিত্তিশীল।

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ এখানে ام الكتاب এর শাব্দিক অর্থ মূলগ্রন্থ। এতে লওহে মাহ্ফুয বোঝানো হয়েছে, যাতে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন হতে পারে না।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি ও অসীম রহস্য জ্ঞান দ্বারা যে বিষয়কে ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যে বিষয়কে ইচ্ছা বহাল ও বিদ্যমান রাখেন। এরপর যা কিছু হয়, তা আল্লাহ্র কাছে সংরক্ষিত থাকে। এর উপর কারও কোন ক্ষমতা চলে না এবং তাতে হ্রাসবৃদ্ধিও হতে পারে না।

তফসীরবিদদের মধ্যে সায়ীদ ইবনে জারীর, কাতাদাহ প্রমুখ এ আয়াতটিকেও আহকাম ও বিধি-বিধানের নসখ্ তথা রহিতকরণ বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত সাব্যস্ত করেছেন। তাঁদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক জাতির জন্য বিভিন্ন পয়গম্বরের মাধ্যমে স্বীয় গ্রন্থ নাযিল করেন। এসব গ্রন্থে যেসব বিধি-বিধান ও ফরায়েয বর্ণিত হয়, সেগুলো চিরস্থায়ী ও সর্বকালে প্রযোজ্য থাকা জরুরী নয়;

বরং জাতিসমূহের অবস্থা ও যুগের পরিবর্তনের সাথে মিল রেখে রহস্যজ্ঞানের মাধ্যমে তিনি যেসব বিধান মিটিয়ে দিতে চান, সেগুলো মিটিয়ে দেন এবং যেগুলো বাকী রাখতে চান সেগুলো বাকী রাখেন। এবং মূল গ্রন্থ সর্বাবস্থায় তাঁর কাছে সংরক্ষিত থাকে। তাতে পূর্বেই লিখিত আছে যে, অমুক জাতির জন্য নাযিলকৃত অমুক বিধানটি একটি বিশেষ মেয়াদের জন্য অথবা বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ধার্যকৃত হয়েছে। সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে কিংবা অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেলে বিধানটিও পরিবর্তিত হয়ে যাবে। মূলগ্রন্থে এর মেয়াদ নির্ধারণের সাথে সাথে একথাও লিপিবদ্ধ আছে যে, এ বিধানটি পরিবর্তন করে তার স্থলে কোন্ বিধান আনয়ন করা হবে।

এ থেকে এ সন্দেহও দূরীভূত হয়ে গেল যে, আল্লাহ্র বিধান কোন সময়ই রহিত না হওয়া উচিত। কারণ, কোন বিধান জারি করার পর তা রহিত করে দিলে বোঝা যায় যে, বিধানদাতা পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ছিলেন না। তাই পরিস্থিতি দেখার পর বিধানটি পরিবর্তন করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্র শান এর অনেক ঊর্ধ্বে। কোন বিষয় তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই। উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, যে নির্দেশটি রহিত করা হয়, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ব থেকেই জানেন যে, এ বিধান মাত্র এতদিনের জন্য জারি করা হয়েছে; এরপর পরিবর্তন করা হবে। উদাহরণত রোগীর অবস্থা দেখে ডাক্তার অথবা হাকীম তখনকার অবস্থার উপযোগী কোন ওষুধ মনোনীত করেন এবং তিনি জানেন যে, এ ওষুধের এই ক্রিয়া হবে। এরপর এই ওষুধ পরিবর্তন করে অন্য ওষুধ দেওয়া হবে। মোটকথা, এই তফসীর অনুযায়ী আয়াতে 'মিটানো' ও 'বাকী রাখার' অর্থ বিধানাবলীকে রহিত করা ও অব্যাহত রাখা।

সুফীয়ান সওরী, ওয়াকী প্রমুখ তফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ আয়াতের ভিন্ন তফসীর বর্ণনা করেছেন। তাতে আয়াতের বিষয়বস্তুকে ভাগ্যলিপির সাথে সম্পর্কযুক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সৃষ্টজীবের ভাগ্য তথা প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স, সারা জীবনের রিযিক, সুখ কিংবা বিপদ এবং এসব বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ্ তা'আলা সূচনালগ্নে সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অতঃপর সন্তান জন্মগ্রহণের সময় ফেরেশতাদেরকেও লিখিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রতি বছর শবে কদরে এ বছরের ব্যাপারাদির তালিকা ফেরেশতাদেরকে সোপর্দ করা হয়।

মোট কথা এই যে, প্রত্যেক সৃষ্টজীবের বয়স, রিযিক, গতিবিধি ইত্যাদি সব নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ ভাগ্যলিপি থেকে যতটুকু ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যতটুকু ইচ্ছা বহাল রাখেন। وَعِنْدَهٗ اُمُّ الْكِتَابِ —অর্থাৎ মিটানো ও বহাল রাখার পর যে মূলগ্রন্থ অবশেষে কার্যকর হয়, তা আল্লাহ্র কাছে রয়েছে। এতে কোন পরিবর্তন হতে পারে না।

বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। অনেক সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, কোন কোন কর্মের দরুন মানুষের বয়স ও রিযিক বৃদ্ধি পায় এবং কোন কোন কর্মের দরুন হ্রাস পায়।

সহীহ বুখারীতে আছে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা বয়স বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। মসনদ-আহমদের রেওয়ায়েতে আছে, মানুষ মাঝে মাঝে এমন গোনাহ করে, যার কারণে তাকে রিযিক থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়। পিতামাতার সেবা-যত্ন ও আনুগত্যের কারণে বয়স বৃদ্ধি পায়। দোয়া ব্যতীত কোন বস্তু তকদীর খণ্ডন করতে পারে না।

এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কারও ভাগ্যলিপিতে যে বয়স, রিযিক ইত্যাদি লিখে দিয়েছেন, তা কোন কোন কর্মের দরুন কম অথবা বেশী হতে পারে এবং দোয়ার কারণেও তা পরিবর্তিত হতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ভাগ্যলিপিতে বয়স, রিযিক, বিপদ অথবা সুখ ইত্যাদিতে কোন কর্ম অথবা দোয়ার কারণে যে পরিবর্তন হয়, তা ঐ ভাগ্য-লিপিতে হয়, যা ফেরেশতাদের হাতে অথবা জ্ঞানে থাকে। এতে কোন সময় কোন নির্দেশ বিশেষ শর্তের সাথে সংযুক্ত থাকে। শর্তটি পাওয়া না গেলে নির্দেশটিও বাকী থাকে না। এ শর্তটি কোন সময় লিখিত আকারে ফেরেশতাদের জ্ঞানে থাকে এবং কোন সময় অলিখিত আকারে শুধু আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানে থাকে। ফলে নির্দেশটি যখন পরিবর্তন করা হয়, তখন সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। এ ভাগ্যকে 'মুআল্লাক' (ঝুলন্ত) বলা হয়। আলোচ্য আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এতে 'মিটানো' ও 'বাকী রাখা'র কাজ অব্যাহত থাকে। কিন্তু আয়াতে শেষ বাক্য وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ব্যক্ত করেছে যে, 'মুআল্লাক ভাগ্য' ছাড়া একটি 'মুবরাম' (চূড়ান্ত) ভাগ্য আছে, যা মূল গ্রন্থে লিখিত অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে রয়েছে। তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জানার জন্যই। এতে ঐসব বিধান লিখিত হয়, যে-গুলো কর্ম ও দোয়ার শর্তের পর সর্বশেষ ফলাফল হয়ে থাকে। এ জন্যই এটা মিটানো ও বহাল রাখা এবং হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ---(ইবনে কাসীর)

وَإِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ -এ আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, ইসলাম চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে এবং কুফর ও কাফিররা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। আল্লাহ্র এ ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কিন্তু আপনি এরূপ চিন্তা করবেন না যে, এ বিজয় কবে হবে। সম্ভবত আপনার জীবদ্দশাতেই হবে এবং এটাও সম্ভব যে, আপনার ওফাতের পরে হবে। আপনার মানসিক প্রশান্তির জন্য তো এটাই যথেষ্ট যে, আপনি অহরহ দেখছেন, আমি কাফিরদের ভূখণ্ড চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে দিচ্ছি অর্থাৎ এসব দিক মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে তাদের অধিকৃত এলাকা হ্রাস পাচ্ছে। এভাবে একদিন এ বিজয় চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে। নির্দেশ আল্লাহ্র হাতেই। তার নির্দেশ খণ্ডনকারী কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

সূরা ইবরাহীম

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৫২ আয়াত ঃ ৭ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ
رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝١ اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ۙ ۝٢ الَّذِيْنَ
يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۗ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ۝٣

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু।

(১) আলিফ-লাম-রা ; এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি---যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন---পরাক্রান্ত, প্রশংসার যোগ্য পালনকর্তার নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে। (২) তিনি আল্লাহ্‌ ; যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সব কিছুর মালিক। কাফিরদের জন্য বিপদ রয়েছে, কঠোর আযাব ; (৩) যারা পরকালের চাইতে পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে ; আল্লাহ্‌র পথে বাধা দান করে এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে, তারা পথ ভুলে দূরে পড়ে আছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলিফ-লাম-রা ; (এর অর্থ তো আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন) ; এটি (কোরআন) একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি (এর সাহায্যে) সব মানুষকে তাদের পালনকর্তার নির্দেশে (প্রচার পর্যায়ে কুফরের) অন্ধকার থেকে বের করে (ঈমান ও হিদায়তের) আলোর দিকে (অর্থাৎ) পরাক্রান্ত, প্রশংসিত সত্তার পথের দিকে আনয়ন করেন (আলোর দিকে আনার অর্থ হচ্ছে আলোর পথ বলে দেওয়া)। যিনি এমন আল্লাহ্‌ যে,

নভোমণ্ডলে যা আছে এবং ভূমণ্ডলে যা আছে, তিনি সেসবের মালিক এবং (যখন এ গ্রন্থ আল্লাহ্‌র পথ বলে দেয়, তখন) বড় পরিতাপ অর্থাৎ কঠোর শাস্তি কাফিরদের জন্য, যারা (এ পথ নিজেরা তো কবুল করেই না ; বরং) পার্থিব জীবনকে পরকালের উপর অগ্রাধিকার দেয়, (ফলে ধর্মের অন্বেষণ করে না) এবং (অন্যদেরকেও এ পথ অবলম্বন করতে দেয় না ; বরং) আল্লাহ্‌র এ (উল্লিখিত) পথে বাধাদান করে এবং তাতে বক্রতা (অর্থাৎ নানাবিধ সন্দেহ) অন্বেষণ করে (যদ্দ্বারা অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারে)। তারা খুব দূরবর্তী পথভ্রষ্টতায় পতিত আছে। (অর্থাৎ এ পথভ্রষ্টতা সত্য থেকে অনেক দূরবর্তী)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ও তার বিষয়বস্তু ঃ এটা কোরআন পাকের চতুর্দশতম সূরা---'সূরা ইবরাহীম'। এটা মক্কায় হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কতিপয় আয়াত সম্পর্কে মতভেদ আছে যে, মক্কায় হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ, না মদীনায় অবতীর্ণ।

এ সূরার শুরুতে রিসালাত, নবুয়ত ও এসবের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা হয়েছে এবং এর সাথে মিল রেখেই সূরার নাম 'সূরা ইবরাহীম' রাখা হয়েছে।

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ

الٓرٰ — এগুলো খণ্ড অক্ষর। এগুলোর তাৎপর্য সম্পর্কে বারবার বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী মনীষীদের অনুসৃত পন্থাই হচ্ছে সব চাইতে নির্মল ও স্বচ্ছ অর্থাৎ এরূপ বিশ্বাস রাখা যে, এ সবের যা অর্থ, তা সত্য। এগুলোর অর্থ কি, সে ব্যাপারে খোঁজাখুঁজি সমীচীন নয়।

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ — ব্যাকরণের দিক দিয়ে একে خبر এর هذا সাব্যস্ত করে এরূপ অর্থ নেওয়াই অধিক স্পষ্ট যে, এটা ঐ গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। এতে অবতীর্ণ করার কাজটি আল্লাহ্‌র দিকে সম্পৃক্ত করা এবং সম্বোধন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দিকে করার মধ্যে দু'টি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এক. এ গ্রন্থটি অত্যন্ত মহান। কারণ একে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন। দুই. রসূলুল্লাহ্ (সা) উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কারণ তিনি এ গ্রন্থের প্রথম সম্বোধিত ব্যক্তি।

لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ এখানে নাস

শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল যুগের মানুষই বোঝান হয়েছে। ظلمات শব্দটি ظلمة এর বহুবচন। এর অর্থ অন্ধকার। এখানে ظلمات বলে কুফর শিরক ও মন্দকর্মের অন্ধকারসমূহ এবং نور বলে ঈমানের আলো বোঝান হয়েছে। এজন্যই ظلمات শব্দটির বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা কুফর ও শিরকের প্রকার অনেক। এমনিভাবে মন্দ কর্মের সংখ্যাও গণনার বাইরে। পক্ষান্তরে نور শব্দটি একবচনে আনা হয়েছে। কেননা, ঈমান ও সত্য এক। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি এ গ্রন্থ এজন্য আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি এর সাহায্যে বিশ্বের মানুষকে কুফর, শিরক ও মন্দ কর্মের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের পালনকর্তার আদেশক্রমে ঈমান ও সত্যের আলোর দিকে আনয়ন করেন। এখানে رب শব্দটি প্রয়োগ করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, গ্রন্থ ও পয়গম্বরের সাহায্যে সর্ব স্তরের মানুষকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দেওয়া---আল্লাহ্ তা'আলার এ অনুগ্রহের একমাত্র কারণ হচ্ছে ঐ কৃপা ও মেহেরবাণী, যা মানব জাতির স্রষ্টা ও প্রভু প্রতিপালকত্বের কারণে মানবজাতির প্রতি নিয়োজিত করে রেখেছেন। নতুবা আল্লাহ্ তা'আলার যিম্মায় না কারও কোন পাওনা আছে এবং না কারও জোর তাঁর উপর চলে।

হিদায়ত শুধু আল্লাহ্র কাজ ঃ আলোচ্য আয়াতে অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে আলোর দিকে আনয়ন করাকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাজ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অথচ হিদায়ত দান করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ; যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ---অর্থাৎ আপনি নিজ ক্ষমতাবলে কোন প্রিয়জনকে হিদায়ত দিতে পারেন না; বরং আল্লাহ্ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা হিদায়ত দেন। এজন্যই আলোচ্য আয়াতে بِإِذْنِ رَبِّهِمْ কথাটি যুক্ত করে এ সন্দেহ দূর করে দেওয়া হয়েছে। কেননা এতে আয়াতের অর্থ এই হয়েছে যে, কুফর ও শিরকের অন্ধকার থেকে বের করে ঈমান ও সৎকর্মের আলোর মধ্যে আনয়ন করার ক্ষমতা যদিও মূলত আপনার হাতে নেই, কিন্তু আল্লাহ্র আদেশ ও অনুমতিক্রমে আপনি তা করতে পারেন।

বিধান ও নির্দেশ ঃ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, মানবজাতিকে মন্দ কর্মের অন্ধকার থেকে বের করা এবং আলোর মধ্যে আনয়ন করার একমাত্র উপায় এবং মানব ও মানবতাকে ইহকাল ও পরকালে ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি দেওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে কোরআন পাক। মানুষ যতই এর নিকটবর্তী হবে, ততই তারা ইহকালেও সুখ-শান্তি নিরাপত্তা ও মনস্তুষ্টি লাভ করবে এবং পরকালেও সাফল্য ও কামিয়াবি অর্জন করবে। পক্ষান্তরে তারা যতই এ থেকে দূরে সরে পড়বে, ততই উভয় জাহানের দুঃখ ক্ষতি, আপদ-বিপদ ও অস্থিরতার গহ্বরে পতিত হবে।

আয়াতের ভাষায় এ-কথা ব্যক্ত করা হয়নি যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) কোরআনের সাহায্যে কিভাবে মানুষকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে আলোর মধ্যে আনয়ন করবেন। কিন্তু এতটুকু অজানা নয় যে, কোন গ্রন্থের সাহায্যে কোন জাতিকে সংশোধন করার উপায় হচ্ছে গ্রন্থের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহকে জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া এবং তাদেরকে এর অনুসারী করা।

কোরআন পাকের তিলাওয়াত একটি স্বতন্ত্র লক্ষ্য ঃ কিন্তু কোরআন পাকের আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এর তিলাওয়াত অর্থাৎ অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করে শুধু শব্দাবলী পাঠ করাও মানুষের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে। কমপক্ষে কুফর ও শিরকের যত মনোমুগ্ধকর জালই হোক, কোরআন তিলাওয়াতকারী অর্থ না বুঝলেও এ জালে আবদ্ধ হতে পারে না। হিন্দুদের শুদ্ধি সংগঠন আন্দোলনের সময় এটা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যে, তাদের জালে এমন কিছু সংখ্যক মুসলমানই মাত্র আবদ্ধ হয়েছিল, যারা কোরআন তিলাওয়াতেও অজ্ঞ ছিল। আজকাল খৃস্টান মিশনারীরা প্রত্যেকটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় নানা ধরনের প্রলোভন ও সেবা প্রদানের জাল নিয়ে ঘোরাফেরা করে। কিন্তু ওদের প্রভাব শুধুমাত্র এমন পরিবারের উপরই পড়ে যারা মূর্খতার কারণে অথবা নব্যশিক্ষার কুপ্রভাবে কোরআন তিলাওয়াত থেকেও গাফিল।

সম্ভবত এই তাত্ত্বিক প্রভাবের দিকে ইঙ্গিত করার জন্য কোরআন পাকে যেখানে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে অর্থ শিক্ষাদানের পূর্বে তিলাওয়াতকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ---অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তিনটি কাজের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এক. কোরআন পাকের তিলাওয়াত। বলা বাহুল্য, তিলাওয়াত শব্দের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থ বোঝা হয়---তিলাওয়াত করা হয় না। দুই. মানুষকে মন্দ কাজকর্ম থেকে পবিত্র করা। তিন. কোরআন পাক ও হিকমত অর্থাৎ সুন্নাহ্র শিক্ষা দান করা।

মোট কথা, কোরআন এমন একটি হিদায়তনামা, যার অর্থ বুঝে তদনুযায়ী কাজ করার মূল লক্ষ্য ছাড়াও মানব জীবনের সংশোধনে এর ক্রিয়াশীল হওয়াও সুস্পষ্ট ; এতদসংগে এর শব্দাবলী তিলাওয়াত করাতেও অজ্ঞাতভাবে মানব মনের সংশোধনে প্রভাব বিস্তার করে।

এ আয়াতে আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনার কাজকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, যদিও হিদায়ত সৃষ্টি করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার কাজ। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে এটা অর্জন করা যায় না। কোরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যাও তাই গ্রহণযোগ্য, যা রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় উক্তি ও কর্ম দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এর বিপরীত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ- اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

—এ আয়াতের শুরুতে যে অন্ধকার ও আলোর উল্লেখ করা হয়েছিল, বলা বাহুল্য, তা ঐ অন্ধকার ও আলো নয়, যা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায়। তাই তা ফুটিয়ে তোলার জন্য এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, ঐ আলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথ। এই পথে যারা চলে, তারা অন্ধকারে চলাচলকারীর অনুরূপ পথভ্রান্ত হয় না, হোঁচট খায় না এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে বিফল মনোরথ হয় না। আল্লাহ্‌র পথ বলে ঐ পথ বোঝান হয়েছে, যেপথে চলে মানুষ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে এবং তাঁর সন্তুষ্টির মর্যাদা অর্জন করতে পারে।

এ স্থলে আল্লাহ্ শব্দটি পরে এবং তাঁর আগে তাঁর দু'টি গুণবাচক নাম عزيز ও حميد উল্লেখ করা হয়েছে। عزيز শব্দের অর্থ শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত এবং حميد শব্দের অর্থ ঐ সত্তা, যিনি প্রশংসার যোগ্য। এ দু'টি গুণবাচক শব্দকে আসল নামের পূর্বে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ পথ পথিককে যে সত্তার দিকে নিয়ে যায়, তিনি পরাক্রান্তও এবং প্রশংসার যোগ্যও। ফলে এ পথের পথিক কোথাও হোঁচট খাবে না এবং তার প্রচেষ্টা বিফলে যাবে না ; বরং তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছা সুনিশ্চিত। শর্ত এই যে, এ পথ ছাড়তে পারবে না।

আল্লাহ্ তা'আলার এ দু'টি গুণ আগে উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ —অর্থাৎ তিনি ঐ সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব কিছুর স্রষ্টা ও মালিক। এতে কোন অংশীদার নেই।

وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ— ويل শব্দের অর্থ কঠোর শাস্তি ও বিপর্যয়। অর্থ এই যে, যারা কোরআনরূপী নিয়ামত অস্বীকার করে এবং অন্ধকারেই থাকতে পছন্দ করে, তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস ও বরবাদী, ঐ কঠোর আযাবের কারণে যা তাদের উপর আপতিত হবে।

সারকথা ঃ আয়াতের সারমর্ম এই যে, সব মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আল্লাহ্‌র পথের আলোতে আনার জন্য কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু যে হতভাগা কোরআনকেই অস্বীকার করে, সে নিজেই নিজেকে আযাবে নিক্ষেপ করে। কোরআন যে আল্লাহ্‌র কালাম, যারা এ বিষয়টিই স্বীকার করে না, তারা তো নিশ্চিতরূপেই উপরোক্ত সাবধান বাণীর লক্ষ্য ; কিন্তু যারা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অস্বীকার করে না, তবে কার্যক্ষেত্রে কোরআনকে ত্যাগ করে বসেছে —তিলাওয়াতের সাথেও কোন সম্পর্ক রাখে না এবং বোঝা ও তা মেনে চলার প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করে না, তারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সাবধান বাণীর আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।

اَلَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ○

এ আয়াতে কোরআনে অবিশ্বাসী কাফিরদের তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এক. তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের তুলনায় অধিক পছন্দ করে এবং অগ্রাধিকার দেয়। এজন্যই পার্থিব লাভ বা আরামের খাতিরে পরকালের ক্ষতি স্বীকার করে নেয়। এতে তাদের রোগ নির্ণয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা কেন কোরআনের সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখা সত্ত্বেও একে অস্বীকার করে? কারণ এই যে, দুনিয়ার বর্তমান জীবনের ভালবাসা তাদেরকে পরকালের ব্যাপারে অন্ধ করে রেখেছে। তাই তারা অন্ধকারকেই পছন্দ করে এবং আলোর দিকে আসার কোন আগ্রহ রাখে না।

দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, তারা নিজেরা তো অন্ধকারে থাকা পছন্দ করেই; তদুপরি সর্বনাশের কথা এই যে, নিজেদের ভ্রান্তি ঢাকা দেওয়ার জন্য অন্যদেরকেও আলোর মহাসড়ক অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে চলতে বাধা দান করে।

কোরআন বোঝার ব্যাপারে কোন কোন ভ্রান্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ ঃ তৃতীয় অবস্থা يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا—বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। এর অর্থ দ্বিবিধ হতে পারে। এক. তারা স্বীয় মন্দ বাসনা ও মন্দ কর্মের কারণে এ চিন্তায় মগ্ন থাকে যে, আল্লাহ্‌র উজ্জ্বল ও সরল পথে কোন বক্রতা ও দোষ দৃষ্টিগোচর হলেই তারা আপত্তি ও ভর্ৎসনা করার সুযোগ পাবে। ইবনে কাসীর এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

দুই. তারা এরূপ খোঁজাখুঁজিতে লেগে থাকে যে, আল্লাহ্‌র পথে অর্থাৎ কোরআন ও হাদীসের কোন বিষয়বস্তু তাদের চিন্তাধারা ও মনোবৃত্তির অনুকূলে পাওয়া যায় কিনা, পাওয়া গেলে সেটাকে তারা নিজেদের সত্যতার প্রমাণ হিসাবে পেশ করতে পারবে, তফসীরে-কুরতুবীতে এ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। আজকাল অসংখ্য পণ্ডিত ব্যক্তি এ ব্যাধিতে আক্রান্ত আছে। তারা মনে মনে একটি চিন্তাধারা কখনও ভ্রান্তিবশত এবং কখনও বিজাতীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে গড়ে নেয়। এরপর কোরআন ও হাদীসে এর সমর্থন তালাশ করে। কোথাও কোন শব্দ এ চিন্তাধারার অনুকূলে দৃষ্টিগোচর হলেই একে নিজেদের পক্ষে কোরআনী প্রমাণ মনে করে। অথচ এ কর্মপন্থাটি নীতিগতভাবেই ভ্রান্ত। কেননা, মু'মিনের কাজ হল নিজস্ব চিন্তাধারা ও মনোবৃত্তি থেকে মুক্ত মন নিয়ে কোরআন ও হাদীসকে দেখা। এরপর এগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে যা প্রমাণিত হয়, সেটাকে নিজের মতবাদ সাব্যস্ত করা।

اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ—উপরে যেসব কাফিরের তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে,

এ বাক্যে তাদেরই অশুভ পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তারা পথ-ভ্রষ্টতায় এত দূর পৌঁছে গেছে যে, সেখান থেকে সৎ পথে ফিরে আসা তাদের পক্ষে কঠিন।

বিধান ও মাস'আলা ঃ তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, এ আয়াতে যদিও কাফির-দের এ তিনটি অবস্থা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদেরই এ পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা পথভ্রষ্টতায় অনেক দূরে চলে গেছে, কিন্তু নীতির দিক দিয়ে যে মুসল-মানের মধ্যে এ তিনটি অবস্থা বিদ্যমান থাকে, সেও এ সাবধান বাণীর যোগ্য। অবস্থাত্রয়ের সারমর্ম এই ঃ

(১) দুনিয়ার মহব্বতকে পরকালের উপর প্রবল রাখা এমনকি ধর্মপথে না আসা।

(২) অন্যদেরকেও নিজের সাথে শরীক রাখার জন্য আল্লাহ্‌র পথে চলতে না দেওয়া।

(৩) কোরআন ও হাদীসের অর্থ পরিবর্তন করে নিজস্ব চিন্তাধারার সাথে খাপ খাও-য়ানোর চেষ্টা করা।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۭ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاۗءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

---

(৪) আমি সব পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বোঝাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (এ গ্রন্থটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কোন কোন কাফির সন্দেহ করে যে, আরবী ভাষায় কেন? এতে তো সম্ভাবনা বোঝা যায় যে, স্বয়ং পয়গম্বর তা রচনা করে থাকবে। অনারব ভাষায় অবতীর্ণ হলে এরূপ সম্ভাবনাই থাকত না এবং অনারব হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য ঐশী গ্রন্থের অনুরূপও হত। তাদের এ সন্দেহ নিরর্থক। কেননা) আমি সব (পূর্ববর্তী) পয়গম্বরকে (ও) তাদেরই সম্প্রদায়ের ভাষায় পয়গম্বর করে প্রেরণ করেছি যাতে (তাদের ভাষায়) তাদের কাছে (আল্লাহ্‌র বিধানসমূহ) বর্ণনা করে। (কারণ, আসল লক্ষ্য হচ্ছে সুস্পষ্ট বর্ণনা। সব গ্রন্থেরই এক ভাষায় হওয়া কোন লক্ষ্য নয়)। অতঃপর (বর্ণনা করার পর) যাকে ইচ্ছা, আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন (অর্থাৎ সে বিধানসমূহ কবুল করে না) এবং যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন (অর্থাৎ সে বিধানসমূহ কবুল করে নেয়)। এবং তিনিই (সব কিছুর উপর) পরাক্রমশালী (এবং) প্রজ্ঞাময় (সুতরাং পরাক্রমশালী হওয়ার কারণে সবাইকে পথপ্রদর্শন করতে পারতেন; কিন্তু প্রজ্ঞাময় হওয়ার কারণে তা করেন নি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার একটি নিয়ামত ও সুবিধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি যখনই কোন রসূল কোন জাতির কাছে প্রেরণ করেছেন, তখনই সেই জাতির ভাষাভাষী রসূল প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি আল্লাহ্র বিধানসমূহ তাদেরই ভাষায় তাদেরই বোধগম্য আঙ্গিকে ব্যক্ত করে এবং তাদের পক্ষে তা বোঝা সহজ হয়। রসূলের ভাষা উম্মতের ভাষা থেকে ভিন্ন হলে বিধি-বিধান বোঝার ব্যাপারে উম্মতকে অনুবাদের ঝুঁকি গ্রহণ করতে হত। এরপরও বিধি-বিধানকে বিশুদ্ধরূপে বোঝার ব্যাপারটিতে সন্দেহ থেকে যেত। তাই হিব্রু ভাষীদের কাছে কোন রসূল প্রেরণ করা হলে তাঁর ভাষাও হিব্রুই হত, পারস্যবাসীদের প্রতি প্রেরিত রসূলের ভাষা ফারসী এবং বার্বারদের প্রতি প্রেরিত রসূলের ভাষা বার্বারী হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। যাকে রসূলরূপে প্রেরণ করা হত, কোন সময় তিনি ঐ জাতিরই একজন হতেন এবং জাতির ভাষাই তাঁর মাতৃভাষা হত। আবার কোন সময় এমনও হয়েছে যে, রসূলের মাতৃভাষা ভিন্ন হলেও আল্লাহ্ তা'আলা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন যে, তিনি ঐ জাতির ভাষা শিখে নিয়েছেন। উদাহরণত হযরত লুত (আ) জন্মগতভাবে ইরাকের অধিবাসী ছিলেন। ইরাকের ভাষা ছিল ফারসী। কিন্তু সিরিয়ায় হিজরত করে তিনি সেখানেই বিবাহ-শাদী করেন এবং তাদের ভাষা শিখে নেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সিরিয়ার এক অংশের রসূল নিযুক্ত করেন।

আমাদের রসূল (সা) স্থানের দিক দিয়ে সারা বিশ্বের জন্য এবং কালের দিক দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। জগতের কোন জাতি, কোন দেশের অধিবাসী এবং কোন ভাষাভাষী তাঁদের রিসালাত ও নবুয়তের আওতাবহির্ভূত নয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত নতুন জাতি ও নতুন ভাষার উদ্ভব হবে, তারা সবাই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্বোধিত উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হবে। কোরআন পাকে বলা হয়েছেঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا — হে লোকসকল! আমি আল্লাহ্র রসূল, তোমাদের সবার প্রতি। সহী বুখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সব পয়গম্বরের মধ্যে নিজের পাঁচটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেনঃ আমার পূর্বে প্রত্যেক রসূল ও নবী বিশেষভাবে নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আমাকেই সমগ্র মানব জাতির জন্য রসূল মনোনীত করে প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ) থেকে জগতে মানব-বসতি শুরু করেছেন এবং তাঁকেই মানব জাতির সর্বপ্রথম নবী ও পয়গম্বর মনোনীত করেন। এরপর পৃথিবীর জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন পয়গম্বরের মাধ্যমে হিদায়ত ও পথ-প্রদর্শনের ব্যবস্থা ততই সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক জাতির অবস্থার উপযোগী বিধি-বিধান ও শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মানব জগতের ক্রমবিকাশ যখন পূর্ণত্বের স্তরে উপনীত হয়েছে, তখন সাইয়েদুল

আওয়ালীন ওয়াল-আখেরীন ইমামুল-আম্বিয়া মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে সমগ্র বিশ্বের জন্য রসূলরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁকে যে গ্রন্থ ও শরীয়ত দান করা হয়েছে, তাকে সমগ্র বিশ্ব এবং কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ ---অর্থাৎ

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য নিয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছি।

পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়ত ও নিজ নিজ সময় এবং ভূখণ্ডের দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। সেগুলোকেও অসম্পূর্ণ বলা যায় না। কিন্তু মুহাম্মদী শরীয়তের সম্পূর্ণতা কোন কোন বিশেষ সময় ও বিশেষ ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ সম্পূর্ণতা সর্বকালীন ও সার্বত্রিক। এ দিক দিয়ে দীনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা এই শরীয়তেরই বৈশিষ্ট্য এবং এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত নবুয়তের পরম্পরা শেষ করে দেওয়া হয়েছে।

কোরআন আরবী ভাষায় কেন? এখানে প্রশ্ন হয় যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতি প্রেরিত রসূল তাদেরই ভাষাভাষী ছিলেন। ফলে তাদেরকে অনুবাদের শ্রম স্বীকার করতে হয়নি। শেষ পয়গম্বরের বেলায় এরূপ হল না কেন? রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শুধু আরবেই কেন আরবী ভাষা দিয়ে প্রেরণ করা হল এবং তাঁর গ্রন্থ কোরআনও আরবী ভাষায়ই কেন নাযিল হল? একটু চিন্তা-ভাবনা করলেই এর উত্তর পরিষ্কার হবে। বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে শত শত ভাষা প্রচলিত রয়েছে। এমতাবস্থায় সবাইকে হিদায়ত করার দু'টি মাত্র উপায় সম্ভবপর ছিল। এক. প্রত্যেক জাতির ভাষায় পৃথক পৃথক কোরআন অবতীর্ণ হওয়া এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শিক্ষাও তদ্রূপ প্রত্যেক জাতির ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন হওয়া। আল্লাহ্র অপার শক্তির সামনে এরূপ ব্যবস্থাপনা মোটেই কঠিন ছিল না কিন্তু সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য এক রসূল, এক গ্রন্থ, এক শরীয়ত প্রেরণ করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে হাজারো মতবিরোধ সত্ত্বেও ধর্মীয়, চারিত্রিক ও সামাজিক ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের যে মহান লক্ষ্য অর্জন করা উদ্দেশ্য ছিল, এমতাবস্থায় তা অর্জিত হত না।

এছাড়া প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশের কোরআন ও হাদীস ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় থাকলে কোরআন পরিবর্তনের অসংখ্য পথ খুলে যেত এবং কোরআন যে একটি সংরক্ষিত কালাম, যা বিজাতি এবং কোরআন অবিশ্বাসীরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে, এ অলৌকিক বৈশিষ্ট্য খতম হয়ে যেত। এছাড়া একই ধর্ম এবং একই গ্রন্থ সত্ত্বেও এর অনুসারীরা শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত এবং তাদের মধ্যে ঐক্যের কোন কেন্দ্রবিন্দুই অবশিষ্ট থাকত না। এক আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল হওয়া সত্ত্বেও এর ব্যাখ্যা ও তফসীরে বৈধ সীমার মধ্যে কত মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে! অবৈধ পন্থায় যেসব মতবিরোধ হয়েছে, সেগুলোর তো ইয়ত্তাই নেই। এ থেকেই উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতা সম্যক অনুমান করা যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যারা কোন না কোন স্তরে কোরআনের বিধি-বিধান পালন করে, তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে।

মোটকথা এই যে, রসূলে করীম (সা)-এর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রত্যেক জাতির ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন কোরআনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ববাসীর শিক্ষা ও হিদায়তের পন্থাকে কোন স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও সঠিক ও নির্ভুল মনে করতে পারে না। তাই দ্বিতীয় পন্থাটিই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তা এই যে, কোরআন একই ভাষায় অবতীর্ণ হবে এবং রসূলের ভাষাও কোরআনেরই ভাষা হবে। এরপর অন্যান্য দেশীয় ও আঞ্চলিক ভাষায় এর অনুবাদ প্রচার করা হবে। নায়েবে রসূল আলিমগণ প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নির্দেশাবলী তাঁদের ভাষায় বুঝাবেন এবং প্রচার করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা এর জন্য বিশ্বের ভাষাসমূহের মধ্য থেকে আরবী ভাষাকে নির্বাচন করেছেন। এর অনেক কারণ রয়েছে।

আরবী ভাষার কতিপয় বৈশিষ্ট্য ঃ প্রথমত আরবী ভাষা ঊর্ধ্ব জগতের সরকারী ভাষা। ফেরেশতাদের ভাষা আরবী, লওহে মাহ্ফুযের ভাষা আরবী; যেমন আয়াত ঃ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ—থেকে জানা যায়। জান্নাত মানুষের আসল দেশ। সেখানে তাকে ফিরে যেতে হবে। সেখানকার ভাষাও আরবী। তাবারান, মুস্তাদরাক, হাকিম ও শোয়াবুল ঈমান বায়হাকীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ احبوا العرب لثلاث لانى عربى والقران عربى وكلام اهل الجنة عربى —এ রেওয়ায়েতকে হাকিম বিশুদ্ধ বলেছেন। জামে সগীরেও বিশুদ্ধ হওয়ার আলামত ব্যক্ত করা হয়েছে। কোন কোন মুহাদ্দিস একে দুর্বল বলেছেন। হাদীস শাস্ত্রজ্ঞ ইবনে তাইমিয়া বলেনঃ এ হাদীসের বিষয়-বস্তুও প্রমাণিত---'হাসান'-এর নিম্নে নয়।--- (ফয়যুল-কাদীর, শরহে জামে সগীর, ১ম খণ্ড ১৭৯ পৃঃ)

হাদীসের অর্থ এই যে, তোমরা তিনটি কারণে আরবকে ভালবাস ঃ (১) আমি আরবীয়, (২) কোরআন আরবী ভাষায় এবং (৩) জান্নাতীদের ভাষা আরবী।

তফসীরে কুরতুবী প্রমুখ গ্রন্থে আরও বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে হযরত আদম (আ)-এর ভাষা ছিল আরবী। পৃথিবীতে অবতরণ ও তওবা কবুল হওয়ার পর আরবী ভাষাই কিছু পরিবর্তিত হয়ে সুরইয়ানী ভাষার রূপ পরিগ্রহ করে।

এ থেকে ঐ রেওয়ায়েতেরও সমর্থন পাওয়া যায়, যা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বরগণের প্রতি যত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, সবগুলোর আসল ভাষা ছিল আরবী। জিবরাঈল (আ) সংশ্লিষ্ট পয়গম্বরের ভাষায় অনুবাদ করে তা পয়গম্বরগণের কাছে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁরা নিজ নিজ জাতীয় ভাষায় তা উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এই রেওয়ায়েতটি আল্লামা সুয়ূতী ইতক্বান গ্রন্থে এবং অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। এর সার বিষয়বস্তু এই যে, সব ঐশী গ্রন্থের আসল ভাষা আরবী। কিন্তু কোরআন ব্যতীত

অন্যান্য গ্রন্থ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর দেশীয় ও জাতীয় ভাষায় অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে। তাই সেগুলোর অর্থসম্ভার তো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ; কিন্তু ভাষা ও শব্দ পরিবর্তিত। এটা একমাত্র কোরআনেরই বৈশিষ্ট্য যে, এর অর্থসম্ভারের মত শব্দাবলীও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত। সম্ভবত এ কারণেই কোরআন দাবী করেছে যে, সমগ্র বিশ্বের জিন্ ও মানব একত্রিত হয়েও কোরআনের একটি ছোট সূরা---বরং আয়াতের অনুরূপ তুল্য রচনা করতে পারবে না। কেননা, এটা অর্থগত ও শব্দগত দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র কালাম এবং আল্লাহ্‌র গুণ। কেউ এর অনুকরণ করতে সক্ষম নয়। অর্থগত দিক দিয়ে তো অন্যান্য ঐশীগ্রন্থ আল্লাহ্‌র কালাম; কিন্তু সেগুলোতে সম্ভবত আসল আরবী ভাষার পরিবর্তে অনূদিত ভাষায় হওয়ার কারণে এই দাবী অন্য কোন ঐশীগ্রন্থ করেনি। নতুবা কোরআনের মত আল্লাহ্‌র কালাম হওয়ার সুবাদে প্রত্যেক গ্রন্থের অদ্বিতীয় ও অনুপম হওয়া নিশ্চিত ছিল।

আরবী ভাষার নিজস্ব গুণাবলীও এ ভাষাকে বেছে নেওয়ার অন্যতম কারণ। এ ভাষায় একটি উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করার জন্য অসংখ্য উপায় ও পথ বিদ্যমান রয়েছে।

আরও একটি কারণ এই যে, মুসলমানকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রকৃতগতভাবেই আরবী ভাষার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি অনায়াসে আরবী ভাষা যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু শিখে নিতে পারে। একারণেই সাহাবায়ে-কিরাম যে দেশেই পৌঁছেছেন, অল্পদিনের মধ্যেই কোনরূপ জোর জবরদস্তি ব্যতিরেকেই সে দেশের ভাষা আরবী হয়ে গেছে। মিসর, সিরিয়া, ইরাক---এ সব দেশের কোনটিরই ভাষা আরবী ছিল না। কিন্তু আজ এগুলো আরবদেশ বলে কথিত হয়।

আরও একটি কারণ এই যে, আরবরা ইসলাম-পূর্বকালে যদিও জঘন্য সব মন্দ কর্মে লিপ্ত ছিল, কিন্তু এমতাবস্থায়ও এ জাতির কর্মক্ষমতা, নৈপুণ্য ও ভাবাবেগ ছিল অনন্যসাধারণ। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ পয়গম্বরকে তাদের মধ্য থেকে উদ্ভূত করেন, তাদের ভাষাকে কোরআনের জন্য পছন্দ করেন এবং রসূল (সা)-কে সর্বপ্রথম তাদের হিদায়ত ও শিক্ষার আদেশ দেন। وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম স্বীয় রসূলের চারপাশে তাদেরই এমন ব্যক্তিবর্গকে জমায়েত করেন, যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য নিজেদের জানমাল, সন্তান-সন্ততি সবকিছু উৎসর্গ করে দেন এবং তাঁর শিক্ষাকে প্রাণের চেয়েও প্রিয় মনে করেন। এভাবে তাদের উপর তাঁর সংসর্গ ও শিক্ষার গভীর প্রভাব প্রতিফলিত হয় এবং তাদের দ্বারা এমন একটি আদর্শ সমাজ অস্তিত্ব লাভ করে, যার নজির ইতিপূর্বে আসমান ও জমিন প্রত্যক্ষ করেনি। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই নজিরবিহীন দলটিকে কোরআনী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য নিযুক্ত করেন এবং বলেন ঃ بلغوا عنى ولو اية অর্থাৎ তোমরা আমার কাছ থেকে শ্রুত প্রত্যেকটি কথা উম্মতের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। সাহাবায়ে কিরাম এই নির্দেশটি অলঙ্ঘনীয় বলে গ্রহণ করে নেন এবং বিশ্বের কোণায় কোণায় পৌঁছে গিয়ে কোরআনের শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাতের পর পঁচিশ বৎসরও অতিক্রান্ত

হয়নি, কোরআনের আওয়ায প্রাচ্য-প্রতীচ্য নির্বিশেষে তদানীন্তন পরিচিত পৃথিবীর সর্বত্র অনুরণিত হতে থাকে।

অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলা তকদীরগত ও সৃষ্টিগতভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দাওয়াত পর্যায়ে উম্মত (দুনিয়ার সব মুশরিক এবং গ্রন্থধারী ইহুদী ও খৃস্টান যাদের অন্তর্ভুক্ত)-এর মধ্যে একটি বিশেষ নৈপুণ্য এবং শিক্ষা-দীক্ষা, গ্রন্থ রচনা ও প্রচারকার্যের এমন অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে দেন যে, এর নজির জগতের অতীত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এর ফলশ্রুতিতে অনারব জাতিসমূহের মধ্যে শুধু কোরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জনের অদম্য স্পৃহাই জাগ্রত হয়নি, বরং আরবী ভাষা শিক্ষা ও তার প্রসারের ক্ষেত্রে অনারবদের অবদান আরবদের চাইতেও কোন অংশে কম নয়।

বর্তমানে আরবী ভাষা, এর বাকপদ্ধতি এবং ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রের যতগুলো গ্রন্থ পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে, সেগুলোর অধিকাংশই অনারব লেখকদের রচিত। এটি এক বিস্ময়কর সত্য বটে। কোরআন ও হাদীসের সংকলন, তফসীর ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও অনারবদের ভূমিকা আরবদের চাইতে কম নয়।

এভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ভাষা এবং তাঁর গ্রন্থ আরবী হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র বিশ্বকে তা বেষ্টন করে নিয়েছে এবং দাওয়াত ও প্রচারের পর্যায়ে আরব ও অনারবের পার্থক্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রত্যেক দেশ, জাতি এবং আরব-ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে এমন আলিম সৃষ্টি হয়েছে, যাঁরা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে নিজ নিজ জাতীয় ভাষায় অত্যন্ত সহজভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক জাতির ভাষায় পয়গম্বর প্রেরণের যে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হতে পারতো, তা অর্জিত হয়ে গেছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ আমি মানুষের সুবিধার জন্য পয়গম্বরগণকে তাদের ভাষায় প্রেরণ করেছি---যাতে পয়গম্বরগণ আমার বিধি-বিধান উত্তমরূপে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু হিদায়ত ও পথভ্রষ্টতা এরপরও মানুষের সাধ্যাধীন নয়। আল্লাহ্ তা'আলাই স্বীয় শক্তিবলে যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্টতায় রাখেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়ত দেন। তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ
وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝ وَاِذْ
قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ
فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْۗءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَاۗءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ
نِسَاۗءَكُمْ ۭ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاۗءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝ وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَىِٕنْ

شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾ وَقَالَ
مُوسَىٰ إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ
لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٨﴾

(৫) আমি মূসাকে নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করেছিলাম যে, স্বজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে আনয়ন এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিনসমূহ স্মরণ করান। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৬) যখন মূসা স্বজাতিকে বললেন ঃ তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর---যখন তিনি তোমাদেরকে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দেন। তারা তোমাদেরকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দিত, তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়েদেরকে জীবিত রাখত। এবং এতে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে বিরাট পরীক্ষা হয়েছিল। (৭) যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর। (৮) এবং মূসা বললেন ঃ তোমরা এবং পৃথিবীস্থ সবাই যদি কুফরী কর, তথাপি আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী, যাবতীয় গুণের আধার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আমি মূসা (আ)-কে স্বীয় নিদর্শনাবলী দিয়ে প্রেরণ করেছি যে, স্বজাতিকে (কুফরী ও গোনাহর) অন্ধকার থেকে (বের করে ঈমান ও আনুগত্যের) আলোর দিকে আনয়ন করুন এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র (নিয়ামত ও আযাবের) ব্যাপারাদি স্মরণ করান। নিশ্চয় এসব ব্যাপারের মধ্যে শিক্ষা রয়েছে প্রত্যেক সবরকারী, শোকরকারীর জন্য। (কেননা, নিয়ামত স্মরণ করে শোকর করবে এবং শাস্তি ও তার অবসান স্মরণ করে ভবিষ্যত বিপদাপদে সবর করবে।) এবং স্মরণ করুন, যখন (আমার উপরোক্ত আদেশ অনুযায়ী) মূসা (আ) (স্বজাতিকে) বললেন ঃ তোমরা নিজেদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামত স্মরণ কর, যখন তোমাদেরকে ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে মুক্তি দেন---যারা তোমাদেরকে অমানুষিক কষ্ট দিত এবং তোমাদের ছেলেসন্তানদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়েদেরকে (অর্থাৎ কন্যাদেরকে, যারা বড় হয়ে বয়স্কা স্ত্রীলোকে পরিণত হয়ে যেত) ছেড়ে দিত (যাতে তাদেরকে শ্রমে নিযুক্ত করে। অতএব, এটাও হত্যার ন্যায় এক প্রকার শাস্তি ছিল।) এবং এতে (অর্থাৎ বিপদ ও মুক্তি উভয়ের মধ্যে) তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে একটি বিরাট পরীক্ষা আছে। [অর্থাৎ মুসিবতে বালা এবং মুক্তিতে নিয়ামত ছিল। বালা ও নিয়ামত উভয়টি বান্দার জন্য পরীক্ষা। সুতরাং একথা বলে মূসা (আ) নিয়ামত ও শাস্তি উভয়টিই স্মরণ করিয়েছেন।] এবং (মূসা আরও বললেন যে, হে আমার সম্প্রদায়) স্মরণ কর,